জাগরণী

শারদ পত্রিকা ১৪৩১

জাগরণী। শারদ সংখ্যা ১৪৩১

প্রকাশনা ও সম্পাদনা : সৌম্যদীপ মহাপাত্র
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৩৬

অক্ষর বিন্যাস, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করন : সৌম্য ক্রিয়েশন
মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১১০১

অঙ্কন ও সহসম্পাদনা : শাশ্বতী বর্মণ
ময়না,পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৪৪

মুদ্রক: ফাস্ট লাইন প্রিন্টার্স
৯০/৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭
khasraprokashoni@gmail.com

ISBN: 978-93-341-1777-6

মূল্য : ১০০ টাকা

॥ সম্পাদকের কলমে ॥

সময়টা ২০২০। সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে করোনা মহামারী, লক-ডাউন, একের পর এক প্রিয়জনদের মৃত্যু সংবাদ। চারিদিকটা কেমন যেন ক্যাওড়াতলার শ্মশানঘাটের মতো হয়ে উঠেছিল। সবকিছু মানিয়ে নিয়ে মোটামুটি চলছিল, কিন্তু মনটা হাউ-হাউ করে উঠেছিল তখন, যখন দুর্গাপূজা তো এসে গেল, তবু করোনা বিধি কমার তো নাম নেই বরং বেড়েই চলেছে। আমাদের বড়োদের না হয় একটা বছর দুর্গাপূজা আনন্দ না করেই কেটে যাবে, কিন্তু ছোট বাচ্চাগুলো? ওদের কি হবে? ওদের আনন্দ কিভাবে মাটি হবে? কিন্তু তেমনটা তো হতে দিলে চলবে না। কিছু তো একটা করতেই হবে ওদের জন্য। এছাড়াও, আমাদের মাঝে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে প্রতিভা তো অনেক রয়েছে, কিন্তু প্রকাশের মাধ্যমের অভাবে সেই প্রতিভা গুলো মাটি চাপা পড়ে গেছে। তবে তাঁদের প্রতিভা কি এইভাবে মাটি চাপা পড়েই নষ্ট হবে? তার থেকে ক্ষতি কি যদি তাঁরা একটা মাধ্যম পান তা প্রকাশের জন্য।বই প্রেমীরা সারা বছর বই তো পড়েন, কিন্তু তাও যদি পুজোর আগে একটা শারদ পত্রিকা তাঁদের হাতে না যায়, তবে তাদের মনটাই কেমন খুঁতখুঁত করতে থাকে, যেন মনে হয়, কি একটা হলো না। আবার এমনও কিছু মানুষ রয়েছেন, যারা এমনিতে হয় তো বই অতটা পড়েন না, কিন্তু প্রতি বছর পুজো এলে শারদ সংখ্যা তাঁরা অবশ্যই পড়েন। তাই এত কিছু চিন্তাভাবনা থেকেই জন্ম নিল "**জাগরণী**"। শুরুতে সেভাবে সাড়া না পাওয়াতে, প্রথম কয়েক বছর "ই-ম্যাগাজিন" রূপেই প্রকাশ পায় জাগরণী। কিন্তু এই বছর সাড়া সেভাবে না পেলেও, অদম্য ইচ্ছা শক্তির জোরে এই প্রথম জাগরণী ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে এল। সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে বইপ্রেমীদের কাছে জাগরণী শারদ সংখ্যা পৌঁছে যাওয়াতেই আমাদের সাফল্য। আশা রাখবো আপনাদের দুর্গাপূজা আনন্দে কাটুক।

সৌম্যদীপ মহাপাত্র
সম্পাদক

।। সহ-সম্পাদিকার কলমে ।।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নারী শক্তির আরাধনা, আগমনীর সুরে নিজেদের ভাসিয়ে দেওয়া, শিউলির গন্ধে মন মাতানো হয়তো এতটাও সহজ না যতটা আমরা ভাবি। যে সমাজ নারী সম্মানে অগ্রসর নয়, নারী স্বাধীনতায় স্বাধীনচেতা নয়, সেই সমাজে নারীশক্তির আরাধনা এক কথায় প্রহসন মাত্র। নারীচেতনার বিকাশ না ঘটলে সামাজিক বিকাশ অসম্ভব। আর সামাজিক বিকাশ না ঘটলে আপামর জনসাধারণ সাথে সামাজিক অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তবু ভুললে হবে না আমাদের মা কালীকে, যিনি রক্তবীজের মতো অসুরকেও মেরে পৃথিবী স্বর্গ কে সচল গতিতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই বর্তমান পরিস্থিতি কাটাতে আমাদেরও হতে হবে মা কালী, এবং সমস্ত ঝঞ্ঝা সরিয়ে আবারও ফিরতে হবে নিজস্ব গতিতে, নিজস্ব মহিমায়।

জাগরণী - এর অর্থও একরকম তাই, অর্থাৎ যে জাগরণ ঘটায়, এবং জাগরণ অর্থাৎ নব অভ্যুত্থান। এই পত্রিকাই যখন বলতে চাইছে নব অভ্যুত্থান, তবে তখন কেন সবাই এখনও এভাবে হসপিটালের আইসিইউ এর মুমুরশু রোগীর মতো জীবনের কালো ঘনঘটার ছায়ায় আসয় নিয়েছে? সবার উচিৎ দলে দলে নতুন ভাবে উদ্যোগ নিয়ে আদ্যাশক্তিকে নতুনভাবে ডাকার, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে মাটি না করার, পুজোকে সফলতা দেওয়ার। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতি তার নিজের কাজ ভোলেনি। সে তার যথার্থ সময়ে যথাযথ কাজ করে চলেছে। এবং সেই ধারা বজায় রাখতে আমাদেরও উচিৎ যথা নিয়মে নিজেদের কাজগুলো করা এবং সেই সাথে যথাযোগ্য সম্মানে মা এর আরাধনা করা।

সবাইকে জানাই শুভ শারদীয়ার অগ্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শাশ্বতী বর্মণ
সহ-সম্পাদিকা



"শিউলির সুবাসে ঝরে যাক যত পাপ,
মায়ের আগমনে তিলোত্তমা বিচার পাক"

সূচীপত্র



লেখকের ডায়েরির দুঃস্বপ্নগুলো

- সৌভিক দে

এক গভীর নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন ছিলাম, যেন সেই নীরবতা থেকে ঘড়ির কাঁটার ক্ষীণতম শব্দও শ্রুতিগোচর হয়। হঠাৎ, যেন কোথা থেকে ভেসে এলো আমার নাম - কে যেন আমাকে ডাকছে। চমকে চোখ মেলতেই দেখি, গাড়ি থেমে গেছে। ড্রাইভার বলছেন, "আপনি যেখানে যেতে বলেছিলেন, সেখানে এসে পৌঁছেছি।"

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম, মন থেকে সকল চিন্তা ও অনুভূতি যেন মুছে গিয়েছিল। এই নিস্তব্ধতা অন্ধকার কক্ষে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠার মতো। আবারও সেই ডাক শুনলাম, এবার আরও স্পষ্ট ও দৃঢ়। তখনই বুঝতে পারলাম, ড্রাইভারকে প্রাপ্য দিতে ভুলে গেছি। তিনি অনেক কিছু বলছিলেন, কিন্তু যেন কোনো শব্দই আমার কানে প্রবেশ করছিল না। গাড়ি থেকে নামতে নামতে ভাবছিলাম, কীভাবে মানুষ দ্রুত হারে সব ভুলে যায়? পিছনে তাকিয়ে দেখি, গাড়িটি ইতিমধ্যে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। আজকের দিনটি অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ, তবুও কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করছিলাম।

বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম, দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড শেষে সেই ঘরের দিকে, যা গত ১২ বছরে আমার কাছে অপরিচিত হয়ে উঠেছে। আজ চারপাশের সবকিছুই যেন অচেনা মনে হচ্ছে। নতুন কিছু সৃষ্টির সাহস ও উদ্দীপনা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে, শুধু অজানা আশঙ্কা বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। এমনই চিন্তায় মগ্ন থেকে বাড়ির কাছাকাছি এসে লক্ষ্য করলাম একটি বইয়ের দোকান, যা আমার নিত্যদিনের যাতায়াত পথে আগে কখনও চোখে পড়েনি। ভালো করে দেখে বুঝলাম, এটি আসলে একটি বাড়ির গ্যারেজ, যা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আজ কোনো কারণে খোলা হয়েছে। দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি ধুলোমাখা বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সত্যি বলতে, সেখানে সব বইয়ের উপরেই ধুলো জমে ছিল, কিন্তু এই বইটি বিশেষভাবে নজরে পড়ল কারণ এটি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার।

বইটির শিরোনাম পড়লাম: "The Dream of a Ridiculous Man" - লেখক ফিওদর দস্তয়েভস্কি। দস্তয়েভস্কির নাম শুনেছি, কিন্তু কোথায় বা কীভাবে, তা মনে করতে পারছি না। বইটি দেখে কেনার তেমন কোনো আগ্রহ জাগেনি, কারণ জীবনে কখনও কোনো বই সম্পূর্ণ পড়িনি। কিন্তু শিরোনামটি আমাকে এক অদ্ভুত কৌতূহলে আচ্ছন্ন করল। মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বই, তাতে এমন কী থাকতে পারে যার জন্য এরকম একটি নাম বেছে নেওয়া হয়েছে? আমার নিজের স্বপ্নগুলো তো সবই দুঃস্বপ্ন, তবে কি এটাও দুঃস্বপ্নের কাহিনী? ছয় মাস ধরে প্রতিদিন যাতায়াত করতে করতে দেখেছি, দোকানটি আর খোলে না। একদিন, বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখি দোকানটি খোলা। মনের অন্তরালে একটা আশা ছিল, যেন বইটা এখনও সেখানে থাকে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম, বইটি আর নেই। অন্যান্য বইগুলো যেমন ছিল, তেমনই আছে, ধুলোয় আচ্ছাদিত - যা স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে কোনো বই বিক্রি হয়নি। বইটি না পেয়ে মনে হলো, যেন আমাকে আমার নিজের সত্তার সাথে মিলিত হতে দেওয়া হলো না।

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলাম, "কেউ আছেন? আমি একটি বিশেষ বইয়ের খোঁজে এসেছি।" কোনো সাড়া না পেয়ে একটু পিছিয়ে এলাম, তবে দোকানের অভ্যন্তরে মনোযোগ সহকারে তাকালাম, বইটি খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশায়। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত উপলব্ধি জাগল - গত বারো বছরে এই সাহস কখনো অনুভব করিনি, আজ কীভাবে সেই সাহস ফিরে পেলাম, যে একটি বইয়ের জন্য আমি নিজে থেকে কথা বলতে এগিয়ে এলাম। এই ক্ষণিক সাহসের উৎস কী? হয়তো সেই ছোট্ট বইটি আমার মধ্যে কোনো অজানা দ্বার খুলে দিয়েছে। হয়তো বা এই মুহূর্তটিই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। যাই হোক, আমি জানি, আজ থেকে আমি আর আগের মতো থাকব না। একটি সাধারণ বইয়ের দোকান, একটি অখ্যাত বই - এগুলো কীভাবে আমার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিল, তা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

এভাবে সেইবারের মতো আবারও আমি পুরনো পথ ধরে এগিয়ে চললাম, কিন্তু এবারের চলার সঙ্গী ছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি। যেন সেই পথের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলছি। সেই হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে ছিল না কোনো চিন্তা, কোনো ভয়, তবু পথ চলার প্রতিটি মুহূর্তই যেন জীবনকে চেপে ধরছিল এক অদৃশ্য ভয়ের বাঁধনে। নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি এতই কঠিন? যদি তাই হয়, তবে অন্য মানুষগুলো কীভাবে সেই কঠিন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর যেন আমার কাছে ছিল না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, কয়েকদিনের মধ্যেই নিজেকে এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড় করাব। জীবনের বাকি থাকা কিছু মুহূর্তের কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ মনে পড়ল সেই পুরনো বইটার কথা। কী ছিল তাতে, এই ভাবনায় আমি অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। অফিসটা ছিল শহরের সবচেয়ে পুরনো একটি বৃষ্টিভেজা এলাকায়, যেখানে দোকানপাট খুবই কম। সেখানে ছিল একটি বড় দেওয়াল, এবং হেঁটে যেতে যেতেই দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সেই দেওয়ালের সামনে। দেওয়ালটি ভর্তি ছিল রাজনৈতিক দলের পোস্টার, কিছু বিজ্ঞাপন, এবং সিনেমার পোস্টারে।

শেষবারের মতো চেয়ে দেখছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল একটি ইংরেজি পোস্টারের কিছু শব্দ: "The Dream of..." এই তিনটি শব্দ পড়তেই মনের মধ্যে এক ঝড়ের সৃষ্টি হলো। আমি সেই ব্যক্তি, যার রোজকার মুহূর্তগুলোকে বুঝতে উঠতেই বছর কেটে যায়, অথচ এবার সেই পোস্টার দেখে যেন চোখের পলকেই সময়ের বাঁধন ভেঙে গেল। The Dream of a Ridiculous Man, ছবিটার শেষ প্রদর্শনীর তারিখ ছিল ৯ নভেম্বর ১৯৯১, রেনিউ অরোরা থিয়েটার। কী যেন এক রহস্যময় টান আমাকে সেই দিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল। মনের ভেতর জমে থাকা বিষাদ এবং জীবনের শেষবারের মতো নিঃশ্বাস, এই সবকিছু হয়তো সেই অদৃশ্য টানের দরুন ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ছুটে চললাম সেই অজানা রহস্যটা জানার জন্য, যেটা হয়তো সেই বইটিই আমার অন্তরে স্তব্ধ করে তুলেছিল সেদিন। সিনেমা হলের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা থাকলেও, এই হলটা ছিল আমার কাছে একেবারেই অচেনা। শহরের শেষ প্রান্তে থাকা এই হলে ভিড় খুবই কম হয় বরাবর।

টিকিট কাউন্টারে গিয়ে দেখলাম, এক বৃদ্ধ লোক বসে আছেন। টিকিট কিনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, লোকটা আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই চাহনিতে ছিল না কোনো ঘৃণা, কষ্ট, বা দুঃখ—ছিল এক ধরনের শূন্যতা। সেই শূন্যতা অনুভব করতেই আমার নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ভয় চেপে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে, সেই চোখের দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ভিতরে ছুটে গেলাম। আমি চাইছিলাম না, সেই শূন্যতার অনুভূতিটা ধরে রাখতে। ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, গোটা হলে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। হলটা দেখে বোঝা যায়, এটি প্রায় ৮০ বছর বা তার বেশি পুরনো হবে। পুরনো পর্দা দেয়াল থেকে খসে পড়ছে, চুনকাম উঠে গেছে অনেক জায়গায়, দেয়ালের

কোণায় জমেছে ধুলো এবং ফাটল ধরা ছাদ। বেশ অবাক লাগল, বিকেল বেলাতেই গোটা হলে আমি একা ছবিটা দেখতে এসেছি অথচ এখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। মানুষের জীবনে হয়তো সত্যিই সময়ের অভাব রয়েছে, অথবা মানুষের পছন্দের প্রসার খুবই সীমিত, যে সে সব জিনিস উপেক্ষা করে যেতে পারে। মনে হলো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি যে নিজের সম্মুখীন হতে চলেছি, তা সম্পূর্ণই আমার নিজেরই। জীবনের বর্তমানকে একা করে রেখে, যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়, তখনই যেন ভয় বেড়ে যায়, আর সেই প্রশ্নের উত্তরটা যদি পেয়ে যাওয়া যায়, তখন তো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

নিমেষের মধ্যে অনুভব করলাম, সকল আলো নিভে গেছে। সামনের পর্দার দিকে একটি ক্ষীণ আলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠল, যেন অন্ধকারের গভীর সাগরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। তারপর, সেই আলোও মিলিয়ে গেল, আর নেমে এল এক গাঢ়, নিস্তব্ধ অন্ধকার, যা যেন আমাকে গ্রাস করতে চাইছিল।

সে সামনের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চলচ্চিত্রটি শুরু হয়ে গেল। প্রথম দৃশ্যেই একটি লণ্ঠন দেখা গেল, যার আলো থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে সেটি একটি ট্রেনের মধ্যে রয়েছে। তারপর, একে একে কয়েকটি লাইন ভেসে উঠল:

“Everything there was exactly like here...
but sparkled with some solemn and holy exultation.
Never in my life had I seen such beauty in a human on our earth.
Only in our children — in first years of their life.
With a single glance at their faces, I understood everything.
Everything!
It was a land not desecrated with sin.
It was inhabited by people who did not trespass.
I saw them with my own eyes, I cognized them
I loved them — and I suffered for them later.
Ah, you old chap. A dream...
is just delusion!
Hallucination.”

“হ্যালুসিনেশন” শব্দটি তার কাছে খুব আপন বলে মনে হলো, কারণ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে একটা হ্যালুসিনেশনের মতোই মনে হতো। মাঝে মাঝে সেটা হয়ে দাঁড়াতো একটা দুঃস্বপ্ন।

ট্রেনের দৃশ্যটি দেখে বুঝলাম, লোকটি ট্রেনের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলে, পাশের যাত্রীরা বলে উঠলো, “এটা শুধু একটা স্বপ্ন।” লোকেরা প্রায়ই তাকে এই ট্রেনের কামরায় ঘুমিয়ে পড়তে দেখতো, আর তার বিকট চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে ওঠাটাও। এই ঘুমের দৃশ্যটা দেখে মনে হলো যেন দুটো অস্পষ্ট ছবি দেখছি, ঠিক যেভাবে আমি নিজেই আমার স্বপ্নে মাঝে মাঝে দেখে উঠি। ঠিক পরেই তার পরবর্তী লাইনগুলো শোনা গেল:

But how can you make a Paradise? I don't know।
Because I'm not able to express it with words.
And at the same time — It's so easy. Imagine: one day...
everything would shape into it.
The key thing is — love others as you love yourself.
That's the main principle.
Nothing else is needed.

It was last November when I comprehended the Truth.
It was exactly the 3d of November, and, since then, I remember every single moment.
I promised myself to commit suicide, and I would have surely done it,
if I hadn't encountered that little girl.
Sir, there! Mommy!
Sir!
Sir!
But I don't care anymore, do I?
For in an hour or two, everything will fade away.
So why will she, or anything on earth, be important to me.
I am turning. Into. Zero.
Into the absolute zero!

দেখা গেল, লোকটা সেই নভেম্বর মাসের স্মৃতিটাকেও মনে করছে। সে চাইলে মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারতো, কিন্তু করলো না। মেয়েটা লোকটার কাছে গিয়ে তার পায়ে ধরে কাকুতি-মিনতি করে বলল, "আমার মাকে বাঁচাও।" লোকটা এক পায়ের ঠেলায় মেয়েটাকে দূরে সরিয়ে দিল। মেয়েটা পড়ে যাওয়ার সময় একটা জুতো খুলে গেল।
লোকটার মাথায় তখন নিজেকে শেষ করার খেয়াল। সে মেয়েটাকে দেখে হয়তো তার দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল মানবিকতার খাতিরে, কিন্তু সেটা সে পারলো না। সে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কী অদ্ভুত মিল খুঁজে পেলাম আমি নিজে আর তার মধ্যে! মনে পড়ে গেল, আমিও ঠিক একইভাবে আচরণ করেছিলাম। আমার কাছেও ছিল আমার প্রিয়জনকে সাহায্য করার সুযোগ। "কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত কান্না তুমি পেয়েছিলে! তুমি আমার কাছে তোমার কষ্ট ব্যক্ত করেছিলে, কিন্তু আমি তো নিজেই নিজের জীবন নিয়ে পেরে উঠিনি। কীভাবে পারতাম আমি তোমাকে সাহায্য করতে? আমি পালিয়ে গেলাম। আমি তোমার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম।

এই ছোট্ট মেয়েটা হয়তো মাত্র একবার এসেছিল তার কাছে। কিন্তু তুমি তো আমার কাছে এসেছিলে পুরো বছর ধরে। শুধু তোমার একটুখানি পাশে থাকার জন্য।" জীবনের সমস্ত করা ভুল আমাকে আস্তে আস্তে চেপে ধরতে লাগলো। আমি নিজের মাথা চেপে ধরে বসে রইলাম, অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লোকটা পালিয়ে যাচ্ছে জনতার ভিড়ের মধ্যে। প্রত্যেকটি মানুষের আওয়াজ তাকে আরও গভীরভাবে ক্ষত করছিল।
(Come on, come on! / Your Excellency, will you, please? / Gee-up! / Here you go!)
Into the zero. / (He's a beggar, a sheer beggar!)
Into the absolute zero.
(No penny for you today, you owe to us!) / Into the absolute zero.

চিৎকার, চেঁচামেচি আর ভিড়ের হট্টগোল।

Who's here? Ok
লোকটাকে একটা ফ্ল্যাটে উঠতে দেখা গেল। অবশেষে বুঝলাম, সে তার ঘরে গিয়ে বসেছে।
তার চেয়ারের সামনে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। সে নিজেকে বলছে:
"So, life and universe now solely depend on me, right?

If a bullet runs into my head, the world will vanish. At least, for me.
I also had an idea at that moment: if I lived on Mars or on the Moon,
and did something disgraceful there, would I care from over here, or not?"

সে আকাশের দিকে তাকালো, তারপর তার হাতঘড়ির দিকে। সে ভাবলো, এখনই একটা বন্দুক কানে ঠেকিয়ে ট্রিগারে চাপ দিলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তা না করে সে তার বন্দুক টাকে তার বুকের পকেটে রাখল। এবং ঠিক তখনই
"And that was when I fell asleep.
I fell asleep insensibly,"

আমি দেখলাম লোকটা মোমবাতির নিচে একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখতে পেল। বাচ্চা মেয়েটি দৌড়ে পালিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে, মেয়েটিকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খেল। মানুষটিকে দেখে বুঝতে পারল সে একটি মুখোশ পরে আছে, কিন্তু সেই ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পেল নিজে একটি গভীর অন্ধকারে পড়ে যাচ্ছে। ঠিক যেভাবে আমি নিজেকে পড়ে যেতে দেখেছিলাম। নিচে নামতে নামতে, ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে, সেই আলোর চিহ্নটাও মুছে যেতে থাকে আর বাড়তে থাকে অন্ধকার, যতক্ষণ না একটা জায়গায় গিয়ে আছড়ে পড়ছি।
"As if continuing to do the reasoning on the same substances."
লোকটি পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেখতে পেল পুরনো সব ভাঙা ঘর, আত্মার অন্ধকার সমুদ্র, লোকজনের অস্থি এবং অজানা মানুষের ভিড়।

"Who's here?
Ah... So, there is life even behind the death's door."
লোকটি নিজেকে এক অপরিচিত জায়গায় খুঁজে পেল। চারদিক সাদা আলোয় ভরা, কিন্তু কেউ নেই। হঠাৎ সামনে থেকে সমুদ্রের জল ছুটে এসে তার পায়ে স্পর্শ করল। ধীরে ধীরে সে চারদিকে পাখির কলরব শুনতে পেল। নিজেকে প্রশ্ন করল,
Can this land be just like ours?
How can there be such a repeat -- and what for?

সে একটি ছোট্ট মেয়েকে বালুকাবেলায় খেলতে দেখল। যখন তার কাছে যেতে চাইল, হঠাৎ বালুর গর্তে পড়ে গেল। সে মেয়েটির কাছে যেতে পারছিল না, যতই চেষ্টা করুক। হয়তো মেয়েটি চাইছিল না তাকে কাছে আসতে দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি শিশু কতক্ষণ নিজের রাগ চেপে রাখতে পারে? মেয়েটি ছুটে এল তার কাছে। কাছে এসে মেয়েটি তার জামা সরিয়ে লক্ষ্য করল লোকটির বুকে গুলির ক্ষত। বুঝতে পারলাম কীভাবে লোকটি নিজেকে স্বপ্নের দেশে নিয়ে গেল। মেয়েটির একটি স্পর্শে সেই ক্ষত মিলিয়ে গেল।
আমি তখন নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "কীভাবে?" নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম যে হয়তো এর উত্তর সেই লোকটিই দিতে পারবে।

লোকটি মেয়েটির চোখের দিকে তাকাল। এই কর্মময় ২৫ বছরের জীবনে আমি কত মানুষের চোখে তাকিয়েছি জানি না, কিন্তু সেই লোকটির মতোই আমারও মনে হল পৃথিবীর সবচেয়ে ভালোবাসাময় বৃষ্টি হয়তো এই ছোট্ট মেয়েটির চোখে রয়েছে। তারপর দেখলাম লোকটির কাছে আরও অনেক মানুষ ছুটে গেল, তাকে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

চারদিকের দৃশ্য অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। গাছপালা, পাখি, ঝরনা আর মানুষের সমাবেশ। জলে মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীল আকাশে শরতের সাদা মেঘের উপস্থিতি। এক অপূর্ব শান্তি। মানুষেরা একে অপরের হাত ধরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ভালোবাসায় গড়া এক অনন্য পরিবেশ। লোকটি লক্ষ্য করল কোন এক বৃদ্ধ তার পা ধুয়ে দিচ্ছে জল দিয়ে। লোকটি তখন নিজেকে বলে উঠলো -
"It was a state of genuine love of each other.
Complete. Universal.
They had love, and they would give birth to children
but I never noticed any outbursts of that brutal lewdness that come upon nearly everyone on our earth — upon anyone and every single one — and that are nearly the sole origin of the mankind's sins."

লোকটি লক্ষ্য করল যে, দূরের ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে সেই বাচ্চা মেয়েটি জল হাতে করে তার দিকে আসছে। প্রতিটি পদক্ষেপে, মেয়েটি যেন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে, ঠিক যেমন সময়ের সাথে সাথে মানুষ পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়। মেয়েটি কাছে এসে তার হাতে কিছু একটা তুলে দিল। লোকটি অবাক হয়ে দেখে, তার হাতে এক নবজাত শিশু, ক্ষুদ্রকায়, যেন একটি চড়ুই পাখির মতো ছোট। শিশুটি শান্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ শিশুটির ঘুম ভাঙলো, সে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লো। এরপর, সেই শিশুটি রূপান্তরিত হয়ে একটি চড়ুই পাখিতে পরিণত হলো এবং তার হাত থেকে উড়ে গেল।
But do I care if it was only a dream or not, if this dream heralded me the Truth.
How come my hetty heart and my freakish paltry mind could rise to such Revelation of Truth?

লোকটির পাশে দাঁড়ানো সেই বৃদ্ধ লোকটি বললো
"I say them myself!
I cognized them and I understood.
I loved them — and I suffered for them later."

লোকটি লক্ষ্য করল, বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন, তখন সূর্যাস্তের সময়। বৃদ্ধ ব্যক্তি সূর্যের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং নিমেষেই তার অস্তিত্ব যেন মাটির সাথে মিশে যেতে শুরু করল। তার হাঁটার জন্য ব্যবহৃত লাঠিটি মাটিতে গাঁথা রইল, এক অসীম নিস্তব্ধতা জড়িয়ে ধরল চারপাশের লোকজনকে। সবাই দাঁড়িয়ে রইল, বিস্ময়ে মোহিত হয়ে। কিন্তু বৃদ্ধের প্রস্থানস্থল থেকে, যেখানে তার লাঠিটি ছিল, সেখানে আস্তে আস্তে একটি গাছ বড় হতে থাকল। শেষমেশ সেই গাছটি এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হল, যা নবজাগরণের প্রতীক।

হঠাৎ করে লোকটি দেখল, চারপাশের সবকিছু সেই গাছের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আস্তে আস্তে সব কিছু মিলিয়ে গেল, আর সে বুঝল যে আবারও ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে আমি নিজেকে প্রশ্ন করল, "এটাই কি সেই জীবন, যা আমি এতদিন লক্ষ্য করিনি? মানুষ কি এত ভুল করেও সব কিছু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে? আমি কি সত্যিই এত কিছু পাওয়ার যোগ্য?"
আরো ভাবতে শুরু করলাম, "যদি আমি সেই মানুষটি হতাম, তবে কি পেতাম? আর আজ যে মানুষ আমি, সে কি তা পাবে?" অনেকক্ষণ চিন্তার পর, অযাচিতভাবে একটু শান্তি তার মনে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু নিজের ধারণা পরিবর্তন করতে তার বেশি সময় লাগল না, কারণ সে জানত স্বপ্নের দুনিয়া আর বাস্তব কখনোই এক হয় না। তবুও, একটি আক্ষেপ রয়ে গেল - এমন অসাধারণ স্বপ্ন তার জীবনে আর কখনো আসেনি।

And now I'm an object of mockery. They say it was only a dream.
But do I care if it was a dream or not, if this dream heralded me the Truth.
I saw the Truth.
I saw it, and I know that people can be beautiful and happy without losing the ability to live on earth.
And this faith of mine is exactly what they make fun of.
But it may have been not a dream.
So far, I kept it back, but now I'm going to say this truth, too.
The thing is that...
...I totally corrupted all their morals.

নিমেষের মধ্যে লোকটি দেখল, সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে এখন বড় হয়ে গেছে, একটি গাছের নিচে নিদ্রিত। তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন মুখোশধারী ব্যক্তি। লোকটি মেয়েটির কাছে গিয়ে তার ঘুম ভাঙাল। চোখ খুলে মেয়েটি দেখল, সাদা পোশাকে আবৃত সেই মুখোশধারী ব্যক্তি তার সামনে বসে আছে।
মুখোশের আড়াল থেকে একটি ঘৃণ্য হাসি ভেসে এল। ধীরে ধীরে ব্যক্তিটি মুখোশ খুলল। তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে, আর মেয়েটি বুঝতে পারল এ আর কেউ নয় ব্যক্তিটি স্বয়ং নিজে।

লোকটির হাসি দেখে মেয়েটি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত রইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল - একটি হাসি যা থামার নয়। উৎসাহে ভরপুর মেয়েটি লোকটির হাত থেকে মুখোশটি কেড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল, অন্যান্য লোকদের দিকে।
তার দৌড়ের সাথে সাথে হাসিটি যেন সমগ্র পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। লোকটি অবাক হয়ে দেখতে লাগল মেয়েটি কোথায় যাচ্ছে। হাসির শব্দ ক্রমশ বাড়তে লাগল, এক থেকে দুই, দুই থেকে বহু - যেন এক নির্জন মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চারপাশে ক্রমশ জনতার আওয়াজ বেড়ে উঠছে।
লোকটি মেয়েটিকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু পেল না। অবশেষে হাসির শব্দ আরও তীব্র হতে থাকল। ভয়ে সে পিছিয়ে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কালো কুকুরটি তার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেটিও রূপান্তরিত হয়ে গেল। এক বীভৎস গর্জন করে কুকুরটি পালিয়ে গেল।
কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল, সূর্যাস্তের দিকে লোকজন দাঁড়িয়ে। সেখানে মেয়েটি ছুটে আসছে, তার পিছনে অসংখ্য মানুষ - সবাই হাসছে। মেয়েটির হাতের মুখোশটি যেন সকলের অন্তরের অন্ধকারকে জাগিয়ে তুলেছে। নতুন লোকেরা তাকে দেখে হাসতে শুরু করে, তার সঙ্গ নেয়। সবাই ছুটছে তার পিছনে। এ এক হাসি, কিন্তু ধ্বংসের হাসি। প্রত্যেকের হাতে এক একটি মুখোশ, তারা হাসতে হাসতে ছুটছে, আরও লোকদের দলে টানছে।
নিরুপায় লোকেরা দেখছে, কিন্তু ধীরে ধীরে তারাও পরিণত হচ্ছে হিংস্র, হাস্যরত মানুষে। জনতার মধ্য থেকে একটি নতুন আকৃতি বেরিয়ে এল - সম্পূর্ণ কালো একটি ছায়া, মুখোশ পরা, কিন্তু বাকি সব কিছু অন্ধকারের মতো।
স্ক্রিনের এই প্রান্তে বসে এত কিছু দেখা আমার জন্য ছিল অসহনীয়। হৃদযন্ত্রণা শুরু হল, চোখে নামল অন্ধকার। মনে হল, দশটি অদৃশ্য হাত আমাকে পিছনে টানছে। আমি পড়ে গেলাম এক অন্ধকার গর্তে। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই কালো ছায়া। ভালো করে লক্ষ্য করলাম, ছায়াটি যখন মুখোশ খুলল, সে আর কেউ নয় - আমি নিজেই। আমি তখন নিজেকে দেখতে পেলাম সেই লোকটির স্বপ্নের মধ্যে।

গ্রামের বাড়িগুলো থেকে লোকজন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছিল। একটি বাড়ি থেকে একজন লোক বেরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল কী হচ্ছে। সে ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেল। জনতা তাকে ধাক্কা দিয়ে তার বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।
কিন্তু লোকটি চুপ করে থাকল না। সে একটি লাঠি নিয়ে নিল, আর অন্যদের মতো একটি মুখোশ পরল - একটি মৃত পশুর খুলি। লোকটি চিৎকার করে উঠল, এত জোরে যে ভিড় পিছিয়ে গেল। আশেপাশের বাড়িঘরের লোকজনের মনে জাগল আতঙ্ক।
এ ছিল না কোনো হাসির মুখোশ বা হাস্যরত ব্যক্তি। এ ছিল রাগ আর ক্রোধের এক ঢেউ, যা পথে আসা সবকিছুকেই ধ্বংস করতে পারে। লোকটি তার লাঠি দিয়ে একটি বড় গাছে আঘাত করল। গাছটি ভেঙে পড়ল একটি শিশুর উপর। শিশুটির আর্তনাদে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে শব্দ মিলিয়ে গেল।
লোকটির এই আচরণে সবাই কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে তারা পায়ের কাছে পড়ে থাকা পাথর কুড়িয়ে নিতে লাগল। লোকটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভাঙা গাছের সামনে। একে একে সবাই তার দিকে পাথর ছুড়তে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে লোকটি চাপা পড়ে গেল একটি অসংখ্য পাথরের স্তূপের নিচে।
ঠিক তখনই লোকেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটি কালো গোলক ধীরে ধীরে সূর্যকে ঢেকে ফেলছে - সূর্যগ্রহণের সূচনা। চারদিকে নেমে এল অন্ধকার। সবার মুখে ফুটে উঠল ভয়ের ছাপ।
একজন মশাল জ্বালিয়ে সূর্যের দিকে তুলে ধরল। সেটি পরিণত হল একটি আগুনের বলয়ে। আমি দেখলাম, একে একে লোকেরা সেই আগুনের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে, জ্বলতে শুরু করছে। ক্রমশ সবাই পরিণত হল আগুনের দানবে। তারা দৌড়াচ্ছে, চিৎকার করছে, হাসছে, কাঁদছে। দূর থেকে দেখা গেল, পুরো গ্রামটাই জ্বলছে।

হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল। বুঝলাম, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল পুরনো স্মৃতি আর দুঃস্বপ্ন। সামনের স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখলাম, ছবিটা শেষ হতে এখনও কিছুটা সময় বাকি। অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটি যে স্বপ্ন দেখছিল, সে দাঁড়িয়ে আছে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া গ্রামের মাঝখানে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে জ্বলন্ত মৃতদেহ। ঠিক মাঝখানে বসে আছে সেই কালো ছায়াটি। সেও আগুনে ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু এখনও হাসছে।

লোকটি সেই ছায়ার পাশ দিয়ে হেঁটে একটি বড় বাড়িতে ঢুকল। সেখানে কয়েকজন বেঁচে থাকা ব্যক্তির সমাবেশ। বাড়ির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় বসে আছে আরেকজন। বুঝলাম, এটি একটি বিচারসভা। সবাই হাতজোড় করে তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে বলছে:
“Yes, we are deceitful, malicious and unjust,
we know it.
But we have science
and we will use it to find the Truth again.
But this time, we will accept the Truth with full conscience,
for knowledge is superior to sensation
cognizance of life is superior to life itself
Every single one belongs to everyone else, and vice versa.”

দেখলাম, বিচারক তার সামনে দাবার গুটি সাজিয়ে রেখেছে। সেই গুটিগুলো ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষেরা। সবাই একে একে নিজেদের এমনভাবে সাজাল যে তৈরি হল এক মানব-পর্বত। সর্বোচ্চ শিখরে

রয়েছে সেই বৃদ্ধ লোক, যে সূর্যাস্তের সময় বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল - যিনি ছিল সত্যের প্রতীক। কিন্তু এই সকল লোকের মাঝেও দেখতে পেলাম সেই ছায়াটি। সে তাদের মধ্যে নেমে এল এবং একজনের পায়ে লাথি মারল। লাথি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মানুষের পাহাড়টি ভেঙে পড়লো।

আমি দেখলাম, স্বপ্ন দেখা সেই রিদিকুলাস ব্যক্তিটি তার কোলে একজন বৃদ্ধকে শুইয়ে রেখেছে। চারপাশের লোকজন ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কেউ উঠতে চেষ্টা করছে, কেউ অন্যকে সাহায্য করছে, আর কেউ হয়তো প্রাণ হারিয়েছে। লোকজন একে একে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম, এটা সেই পুরনো অরাজকতার শুরু। সেই পাগলের মতো ছুটে যাওয়া হাসির ভিড়, সেই লোকজনদের উপর আক্রমণাত্মক ব্যক্তিরা - সবকিছুই এই লোকটিকে আর শান্ত থাকতে দিচ্ছিল না। লোকটি দেখল, সেই ছায়াটি কোনো এক সাধারণ মানুষের কাঁধে বসে আছে এবং বলছে:
"Who's here? Who's here? Who's here?"
লোকটি যখন তার কোলে শুয়ে থাকা বৃদ্ধটিকে দেখল, তখন সে যেন মুহূর্তেই রূপান্তরিত হলো একটি শিশুরূপে। বৃদ্ধটির মুখাবয়ব যেন ছিল তারই প্রতিচ্ছবি। শিশুটি তাকে দেখে একটুখানি হেসে উঠল, আর সে ধীরে ধীরে বালুতে পরিণত হলো। লোকটি বিস্ময়ে লক্ষ্য করল, তার চারপাশের সমস্তকিছুই যেন বালুর মূর্ত রূপে পরিণত হয়েছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল এক উঁচু পাহাড়ের উপরে, আর হঠাৎ করেই সেই বালু ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়তে লাগল। দূরে, একটি স্থানে সে দেখল, সেই শিশুটি বালুর সঙ্গে খেলা করছে। লোকটি তৎক্ষণাৎ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেই বালুর গভীরে তলিয়ে গেল। সে আতঙ্কে হাতড়াতে লাগল, আর দেখতে পেল, সেই বিশাল বালুর ঢেউ এসে শিশুটিকে গ্রাস করতে চলেছে। তখনই সে চিৎকার করে উঠল:
Who's here?!
লোকটি হঠাৎ জেগে উঠল, যেন দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেল। চোখ খুলে সে দেখল, তার সামনে একটি শিশু ঘুমাচ্ছে, এবং সে-ও যেন তার চিৎকারে জেগে উঠেছে। ক্যারিজের অন্যান্য যাত্রীরা বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

They say, I was dreaming, deluded, hallucinating...
A dream? What is a dream?
You mean, our life is not what we see when we sleep?
Okay, let it be so.
But I wanted to extinguish the life that you celebrate so much, with suicide
And my dream,
আমি দেখলাম সেই শিশুটি, যে লোকটির সামনে শুয়ে ছিল, সে উঠে এসে লোকটির মুখে চেপে ধরা হাতগুলো সরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, সে ঠিক আছে কিনা। শিশুটি তাকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরল।
It heralded me the new, the great, the revived life.
The end.

স্ক্রিনে অন্ধকার নেমে এল, আর আমি বসে রইলাম সেই দৃশ্যের গভীরে ডুবে। সেই কান্না, যা হয়তো কখনো শেষ হবে না। কিন্তু আমি চাই, যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ সেই কান্নার জোয়ার বইতে থাকুক।

দেবীর অকাল বোধন

- পাপিয়া মাজী



সময়টা আশ্বিনের শেষের, এক বছর সময় অপেক্ষার পর বাংলার শহরতলির আনাচে-কানাচে যেমন রঙিন আলো, ঢাকের গুড়গুড় আর চেনা ধূপের গন্ধে মেতে উঠেছিলো, ঠিক তেমনি বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ডেল্টার অর্ন্তগত ছোট্টো অখ্যাত গ্রাম সীতারামপুরেও মা এসেছিলেন হয়তো স্বয়ং এসেছিলেন।

সীতারামপুরে সুন্দরবনের ইলিশ উৎসব তো দূরে থাক, খান দশেক সম্পন্ন ঘর ছাড়া সারা গ্রামের ভরসা সেই কেরোসিনের আর রেড়ির তেলের বাতি। হঠাৎ এসে পড়লে মনে হবে আমাদের সভ্যতার সাথে তাল রাখতে না পেরে প্রকৃতীর কোলে মুখ লুকিয়ে বেঁচে আছে এই গ্রাম।
গ্রামের সবচেয়ে উঁচু তিনতলা বাড়ি, শিবনাথ সামন্তের বনেদী ধাঁচের বাড়ি, ঠাকুরদালান, বাগানবাড়ি, সব মিলিয়ে হতভাগাদের মাঝে যেনো ভাগ্যদেবীর অধিষ্ঠান। কলকাতা শহরে শিবনাথের পুরোনো কিসের কারবার আছে, ইদানীং তা বেশ ফুলেফেঁপেই উঠেছে। শিবনাথ বেশ রাশভারী মানুষ, বছরের দুটো সময়ে সপরিবারে তিনি এই বাড়িতে এসে কিছুদিন থাকেন, শরতের এই পুজোর সময় আর শীতের ডিসেম্বরে। পরিবার বলতে শিবনাথের নিজের ছেলেপুলে নেই, শিবনাথের ভাই সতীনাথের এক পুত্র আর এক কন্যা। বিগত দশ বছর ধরে পূজোর সময় শিবনাথ সামন্ত গ্রামের মানুষের হাতে নতুন কাপড়জামা তুলে দেন, শীতে আবার দান করেন কম্বল। এই দিনগুলোতে গ্রামের অলিগলি মাঠে বিকেলের আড্ডায় সরল মনের গ্রাম্য মহিলা পুরুষের আলোচনার

মূল বিষয় সামন্ত বাড়ি, কেউ টাটকা মাছ দিয়ে বকশিস পায় তো দকেউ বাড়ির কলাটা মুলোটা দিয়ে নগদ কিছু টাকা পায়। তাই সামন্তদের কলকাতায় কিসের কারবার, তা নিয়ে আলোচনা বেশিদূর এগোয়না। শুধু উপহারেই থেমে থাকেনা, ষষ্ঠীতে সামন্তদের ঠাকুরদালানে যখন ঢাক গুড়গুড় করে ওঠে, তখন থেকে দশমীর ঢাকের শব্দ যতক্ষন শোনা যায়, ততক্ষন উনুন জ্বলেনা গ্রামের কোনো বাড়িতে। প্রতিদিন পূজোর প্রসাদে এতো রকম ফল মিষ্টি থাকে, যার অনেকগুলোই আজন্ম চোখেও দেখেনি হাভাতে গ্রামবাসী। যেনো হঠাৎ সম্পন্নতার ঢেউ খেলে যায় সারা সীতারামপুরে।

শিবনাথের ভাইপো অভিরাজ এবারে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমেরিকায় চাকরি পেয়েছে, পূজার পরেই দেশ ছাড়বে। আর বাড়ির একমাত্র কন্যারত্ন পার্বতী কলকাতার কলেজে ফাইন আর্টসের ছাত্রী। বাড়ি ফিরেই তার বায়না এবার পূজায় নতুন কিছু করতে হবে। একথা শুনেই দুই মধ্যবয়স্ক দম্পতি চিন্তায় পড়লেন, পূজা মানে আজীবন তারা দেখে আসছেন, ঢাকের বাদ্যি, নদীর পাড়ে কাশের বন, দীঘির পদ্মফুল, বাড়ির বিশাল গাছের অজস্র শিউলি ফুল, রাত জেগে ভোগের জোগাড় আর ভোর হলেই পূজার তোড়জোড়, সারা গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া আর দশমীর সিঁদুর রাঙা প্রতিমাকে বিষাদ ভরা মন নিয়ে নদীতে বিসর্জিত করে ফেরা। এর বেশি পূজায় নতুন আর কি হতে পারে, তা তারা অনেক ভেবেও যখন পেলেন না, তখন শিবনাথ বললেন, “ও ব্যাপারটা তুই আর অভি মিলেই ভাব, টাকাপয়সা যা লাগবে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে”। শুনে পার্বতী মহা উৎসাহে দাদার ঘরের দিকে দৌড় দিলো। অভিরাজের ঘর অন্ধকার, সে ঘরে নেই, বিছানার ওপর ল্যাপটপটা খোলা। পার্বতী ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলো, আলো জ্বালিয়ে দাদাকে খুঁজতে গিয়ে তার চোখ আটকে গেলো ল্যাপটপের স্ক্রিনে। একটা হাইড্রলিক ডিজাইন, ঠিক যেনো একটা বড়ো পাইপের মাঝের অংশ কেটে একটা ঘর বসানো। পার্বতী ভালো করে দেখতে লাগলো। আর একটা উইন্ডো খুলে দেখলো কিসব হিজিবিজি লেখা। সে সবে দেখতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ অভি ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলো। এক ঝটকায় ল্যাপটপ বন্ধ করে সে বোনকে ভীষণ জোরে বকতে লাগলো। চিৎকার শুনে শিবনাথ ঘরে এলেন আর সব শুনে গম্ভীর মুখে কয়েক সেকেন্ড কি যেনো ভাবলেন এবং পরমুহূর্তেই হাসিমুখে পার্বতীর আসার কারনটা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন। পার্বতী কাঁদতে কাঁদতে যেমন দৌড়ে ঘরে এসেছিলো ঠিক তেমনি বেরিয়ে গেলো। তার আরো কিছু পরে শিবনাথ ভাইপোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

ষষ্ঠীর দিন সকালে গ্রামের মুরুব্বিদের নিয়ে সামন্ত পরিবার সারা গ্রামের লোককে নতুন পোশাক দান করলেন, তারপর আলোচনায় ঠিক হলো অষ্টমীতে ঢাক বাজানো আর দশমীতে ধুনুচি নাচের প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছেলে মেয়েদের সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো, ঠিক হলো দেবীমূর্তির বিসর্জনের পর নদীর এপার থেকে ওপার করতে হবে আর প্রথম পাঁচজনের হাতে নগদ অর্থ দেওয়া হবে।

শান্ত গ্রামের বাতাস পুজোর মিষ্টি ধুনোর গন্ধ গায়ে মেখে ঢাকের বাদ্যির তালে আনন্দে যেনো নাচতে লাগলো। মায়ের আরাধনা আর পুষ্পাঞ্জলির সাথে লুচি, মিষ্টি, চিড়ে, ফলার ইত্যাদির সাথে হাসি-গপ্পো চলতে লাগলো রোজ বেশ রাত অবধি। অষ্টমীর সকালে কাগজপত্রের কাজে কলকাতায় ফিরতে হলো অভিরাজকে। বাড়ির সকলে মুখ ভার করে রইলো, খালি শিবনাথ যখন গাড়ি বারান্দায় অভিরাজকে একটা কাগজ দিয়ে খাটো গলায় কিছু বলছিলো, তখন সন্তর্পণে কেউ তাদের আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সন্ধি পূজার সময় এসে উপস্থিত হলো, শত দীপের আলোকে দেবী মূর্তি যেনো আরো দীপ্ত হয়ে উঠেছেন, যেনো কোনো এক প্রার্থনার জোরে তিনি স্বয়ং এসেছেন। হাত জোড় করে পার্বতী, দেবী মায়ের কাছে কি যেনো প্রার্থনা করতে লাগলো। নবমীর বিকেলে মহা ধুমধামে আনা হলো কুমারী কন্যাকে, ঠাকুরদালানে ঝাঁজ ঘড়ি ঘন্টা শাঁখের মঙ্গলধুনিতে মায়ের

স্বত্ত্বাকে বালিকা স্বরূপে পূজা করা হলো। সোনার গয়না, পিতল বাসন, আরো অনেক দান নিয়ে কুমারী কন্যা বিদায় নিলেন। আর সকলের অলক্ষ্যে পার্বতী কুমারীর কানে কিছু একটা বলে তার হাতে বেঁধে দিলো একটা সাধারন আকারের রিস্ট ব্যান্ড যা আসলে পার্বতীর ফোনের সাথে কানেক্ট করা একটা জিপিএস ট্র্যাকার।

প্রতিবছর দশমী তিথিতে মায়ের বিসর্জনের পর পুজিতা কুমারী কন্যা নিখোঁজ হয়ে যায় এই গ্রামে। এ যেনো এক আভিশাপের মতো বিঁধে আছে সীতারামপুরের কপালে। ছোটোবেলায় পার্বতী বাবার মুখে এই নিয়ে অনেক গল্প শুনেছে, বাবা বলতেন স্বয়ং দেবী নাকি সাথে করে নিয়ে যান কুমারীকে। সারা গ্রামেও এই গল্পই লোকমুখে ঘুরে বেড়াতো। গরীব ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ ও গ্রামের লোকেরা দেবী রুষ্ট হবেন পাছে, সেই ভয়ে সামন্ত বাড়ির পুজোতে কুমারী কন্যা সরবরাহ করতে দ্বিধা করেনি কখনো।

দেখতে দেখতে দশমী তিথি উপস্থিত হলো। দুরুদুরু বুকে সকলে মায়ের বির্সজনে শামিল হলো, সিঁদুর খেলায় প্রায় সকলেই কুমারী কন্যা নিখোজ হওয়া ভুলে মেতে উঠলো, শুধু একটা মেয়ে সিঁদুরখেলার মাঝে আস্তে আস্তে ঠাকুরদালান ছেড়ে বাড়ির পেছনের যে রাস্তাটা নদীর দিকে চলে গেছে, অতি সর্ন্তপনে সেই দিকে চলতে লাগলো। দীর্ঘদিন অব্যাবহারের কারনে প্রায় কাঁটাজঙ্গলে ভরে যাওয়া রাস্তায় পা কেটে যাচ্ছে, চোখে জলের ধারা অবিশ্রান্ত গড়াচ্ছে, মেয়েটি তবুও থামছে না, যেনো দৃঢ় কোনো সংকল্পে তার গতি আজ অপ্রতিরোধ্য। নদীপারে জঙ্গল যেখানে একটু পাতলা, তবে কেয়া ঝাড়ে ভরা, সেখানে প্রায় ভাঙা একটা মন্দির, সাপ,জঙ্গল আর অভিশাপের ভয়ে গাঁয়ের কেউ সেখানে পারতপক্ষে যায়না। মেয়েটা সেই মন্দিরের সামনে এসে মাটির দিকে চোখ রেখে কি যেনো খুঁজতে লাগলো, মন্দিরের চাতালে উঠে বন্ধ দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কেমন যেনো খটকা লাগলো তার, পরিত্যাক্ত মন্দিরের দরজা এতো অক্ষত কিভাবে! মন্দিরের দরজায় বিশেষ মুদ্রায় ষোলোটি নারীমূর্তি আঁকা, মেয়েটি মনযোগ দিয়ে সবটা দেখতে লাগলো, সে আর কেউ নয়, সামন্তদের বাড়ির মেয়ে পার্বতী। দেবী চন্ডীর এই মন্দিরে আসলে বৈদিক ধর্মমতে নারীদের ষোলোকলা অর্থাৎ নিবৃতি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, স্থিতপ্রঙ্গ, ইন্দিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, পরা, অমৃত, সুক্ষ্মজ্ঞান অমৃত, অপার, কর্ম, ব্যাপিনী, ব্যোম রূপা, সম্পর্কিত ছবি আঁকা, তা বুঝতে পারলো পার্বতী। একটা একটা করে ছবির খাপ ছুঁয়ে আলতো চাপ দিতে থাকে পার্বতী। একসময় মোচিকা আঁকা খাপে হাত দিয়ে অল্প চাপ দিতেই দরজা আস্তে আস্তে ফাঁক হতে থাকে। মনের সব শক্তি একজোট করে ভেতরে ঢোকে সে। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঘুটঘুটে অন্ধকার, ধীরে ধীরে চোখ সয়ে এলে সে দেখতে পায় আবছা আলোয় দেবী চন্ডীকার মূর্তির পায়ে প্রায় নিভে আসা একটা প্রদীপ, আর তার পাশেই পড়ে আছে একটা বিশেষ জবা ফুল, দেখেই চমকে ওঠে সে, পরিত্যাক্ত মন্দিরের মূর্তির আরাধনা করে কে! আর এই জবা! এ যে তার চেনা। ভেবেই তার শরীরটা ঘিনিয়ে উঠতে লাগলো। আরো একবার মনের সমস্ত শক্তি একজোট করে আশপাশে কিছু একটা খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ কি একটা মনে পড়তেই গর্ভগৃহের মূর্তির সামনে জোড়হাতে দাঁড়ালো সে, তারপর মূর্তিটা বেদী থেকে তুলে ফেললো আর মন্দিরের মধ্যে একটা কুলুঙ্গিতে রেখে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের মেঝের এককোন সরে গিয়ে একটা সিঁড়ির মুখ খুলে গেলো, তার সামনে গিয়ে পার্বতী দেখলো সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো, কিছুদূর নামার পর একটা প্যাসেজ এলো, সেটা ধরে এগোতেই একটা লোহার দরজা চোখে পড়লো, যেটায় দেবী দশভূজার মূর্তি খোদাই করা আছে। একবার দেখেই অসঙ্গতিটা চোখে পড়লো পার্বতীর, যমরাজের দেওয়া কালদন্ডটা যে হাতে থাকার কথা, সে হাতে আছে শঙ্খ আর যে হাতে শঙ্খ থাকার কথা সে হাতে কালদন্ড। পার্বতী তাড়াতাড়ি করে সঠিক হাতে সঠিক অস্ত্র রেখে দিতেই দরজা ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলো, মিনিটখানেক পর দরজা খুলে সামনে এলো একটা কুঠুরি। ভেতরে অদ্ভুত একটা নীল আভা ছড়িয়ে

আছে, যা ঘরটাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে এলো পার্বতী, নীল আভায় চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তার। কিছুক্ষণ পর সবটা পরিষ্কার হলে সে দেখলো ভেতরে একটা জলের কলশি ছাড়া আর কিছুই নেই। এবার তার চোখ পড়লো ঘরের একটা কোনে, গা শিউরে উঠলো তার, নতুন চেলী পরনে একটা ছোট্টো মেয়ে নিস্তেজ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। একছুটে মেয়েটার কাছে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো পার্বতী, মুখটা চিনতে একটুও অসুবিধা হলোনা তার। এই মেয়েটাকেই দুদিন আগে তাদের বাড়ির ঠাকুরদালানে কুমারীবেশে পূজা করা হয়েছিলো। তবে তার সন্দেহই ঠিক! সীতারামপুরের কুমারী অর্ন্তধান রহস্য কোনো দেবীর অভিশাপ নয়, মানুষের কীর্তি! এবার দুয়ে দুয়ে চার করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলোনা তার, দাদার ল্যাপটপের নকশাটা মনে পড়লো, সে কুমারীকে কোলে নিয়েই ঘরটা থেকে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, দরজার সামনের প্যাসেজে একটা দীর্ঘকায় মানুষের ছায়া ধীরে ধীরে ঘন হতে লাগলো, তার পাশে আরো একটা ছায়া এসে দাঁড়ালো। অতিপরিচিত একটা গম্ভীর গলায় আদেশ এলো, “পার্বতী, মা ওকে যেখান থেকে তুলেছো সেখানেই রেখে বেরিয়ে এসো, আমাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলো”। পার্বতী দৃঢ় গলায় জবাব দিলো, “জ্যাঠু, আমি আর এই নোংরামি করতে দেবোনা তোমাকে, আমি জানি, দাদাও তোমার সাথে এই নরকের শরীক।” কিছুক্ষন সব চুপ। নিস্তব্ধতা ভেঙে আবার সেই কন্ঠ নির্মম অট্টহাসিতে যেনো ফেটে পড়লো। উত্তর এলো, “ও সব জেনে গেছিস তাহলে তুই, তাহলে তো তোকে আর ক্ষমা করে দেবীর অপমান করা যাবে না, তবে বন্দি থাক তুই। কাল তোর ব্যাবস্থাও হবে! জয় মা কালী, চল অভি”। শুনেই পার্বতীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আসন্ন বিপদের সংকেত দিয়ে সজাগ হয়ে উঠলো, সে ঘরের দেওয়ালে একটা বিশেষ সুইচ চেপে ধরলো আর তক্ষুনি সারা প্যাসেজ আর কুঠুরি ভীষণভাবে কাঁপতে লাগলো। আর সময় নষ্ট করা চলবেনা, একছুটে বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে দরজা পেরোতে গেলো পার্বতী। ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে যাওয়া শিবনাথ আর অভিরাজকে একরকম ঠেলে দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিলো, তার উল্টোদিকের প্যাসেজ ধরে ছুটতে থাকলো সে। ওদিকে পার্বতীর ধাক্কায় অভিরাজ কুঠুরির মধ্যে পড়ে গেলো আর শিবনাথ পড়ে গেলো দরজার সামনে, কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো আর দরজার দেবীর হাতের ত্রিশূলটা আমূল বিঁধে গেলো শিবনাথের বুকে। মরণ আর্তনাদের সাথে একটা মুক্তির আশায় চিৎকার ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে থাকে, একসময় সেটা হারিয়ে যায় নদীর অতলে, চিরতরে।

ওদিকে পার্বতী ছুটছে, একসময় আলোর রেখা দেখে প্যাসেজের মুখে চলে এলো সে। সে যেখানে কুমারীকে নিয়ে পৌঁছালো সেটা নদীর আর একটা ধার। ওপারে তাকিয়ে সে দেখলো দেবী বির্সজন সেরে সবাই ফিরতি পথ ধরেছে। পার্বতী ঘাটে বাঁধা একটা ডিঙিতে উঠে পড়লো কুমারীকে নিয়ে, বাঁশের লগি দিয়ে ডিঙি বাইতে লাগলো। একসময় জলে ভাসা দেবীমূর্তির পাশে এসে পড়লো ছোট্টো ডিঙিটা। দুহাত জোড় করে প্রনাম করলো, পার্বতী তারপর নদীর জলের ছিটে মারলো অচৈতন্য কুমারীর মুখে। কোনো এক মন্ত্রবলে বাচ্চা মেয়েটা উঠে বসলো, আর পার্বতীকে জড়িয়ে ধরলো, পার্বতীও তাকে জড়িয়ে ধরলো। দুই অপরিচিতা কন্যা যে বন্ধনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলো, তা সব জাগতিক মোহ মায়ার উর্দ্ধে, যার পরিমাপ নেই, নেই কোনো পরিসীমা। গ্রামের লোক দেখলো অস্তগামী সূর্যদেব যখন দশমীর শেষ সিঁদুর ছড়িয়ে দিলেন আকাশে, তখন ঘাটে এসে ভিড়লো একটা নৌকা, সেখান থেকে নেমে

এলো সামন্তদের মেয়ে পার্বতী আর তার কোলে হারিয়ে যাওয়া কুমারী কন্যা। পার্বতীর রক্তাক্ত পায়ের ছাপ যেনো দেবীর পদচিহ্ন! ভিড়ের মধ্যে কেউ বলে উঠলো, “মায়ের বির্সজন হয়না, মায়ের বির্সজন হয়না। দশমীর বিষাদের সুর কেটে গিয়ে পরাপ্রকৃতীর অন্দরে ধ্বনিত হলো ‘অকাল বোধন’, মা যেনো স্বয়ং বলে উঠলেন-

“ইত্থং যদা যদা বাধা দানাবোথা ভবিষ্যতি।।
তদা তদাবতীর্যাহাং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম।।”

দেজা ভু

- অরিত্র মুখার্জ্জী



শ্রাবন মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার জন্য, বেলা ১০ টা বাজলেও, মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মেদিনীপুরের একটি তিন কামরার ফ্ল্যাটের বারান্দায়, ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে, কফি পান করছিল স্বর্ণেন্দু। স্বর্ণেন্দু রায়, মেদিনীপুরের এক কলেজের ইংলিশের প্রফেসর। ব্যাচেলর, বাড়ি তমলুক, কাজের সূত্রে থাকে মেদিনীপুরে। আজ রবিবার কলেজ বন্ধ, সে তাই দিনটা কফি সহযোগে মিখাইল বুলগাকফের "দি মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা"-এর পাতায় মনোনিবেশ করেছে। কিন্তু হায়, ম্যান প্রপোজেস্ গড্ ডিসপজেস্। স্বর্ণেন্দুর একাগ্রতার জালে জল ঢেলে, বা বলা ভালো "শুকনো লঙ্কা" ঢেলে দিল, রান্নাঘর থেকে আসা প্রবল ফোড়নের তেজ। তার ধাক্কায় সে কেশে-টেশে একাকার। একটু ধাতস্থ হয়ে হাঁক ছাড়ল, "ও মনাদা, বলি আমাকে মার্ডার করার তালে আছ নাকি?"

রান্নাঘর থেকে কাশির শব্দের সাথে মকটেল হয়ে ভেসে আসলো, "ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে লাভ কি? আর তাছাড়া হত্যার অস্ত্র পেশ করতে বললে, কি বলবে? হত্যার অস্ত্র শুকনো লঙ্কার ফোড়ন?"

বলতে বলতে রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে বেড়িয়ে এল মনাদা, ওরফে মনোরঞ্জন সান্যাল। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ লিটারেচার প্রফেসর।
কাশি সামলে নিয়ে স্বর্ণেন্দু বলল, "যাই হোক, তা খিচুড়ির সাথে কি হচ্ছে আজকে?"
"ইলিশ ভাজা।"
শুনে স্বর্ণেন্দুর চোখ চকচক করে উঠলো। "আরিব্বাস! দুপুরে তো তাহলে দাওয়াত।"
"দাওয়াত টা আর হবে না মনে হয়।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মনা।
"কেন?"
"পরেশ-টা সেই সকালে গেছে বাজারে, এখনো ফেরার নাম নেই।"
বলতে বলতে পাশের টেবিলে রাখা স্বর্ণেন্দুর মোবাইলটা বেজে উঠল। পরেশের ফোন।
"কিরে পরেশ, তুই কি ডাইরেক্ট নদী থেকে ইলিশ নিতে গেছিস নাকি? তাহলে তোর সাইজের একখান তুলে আন।"
"ভাই, বৃষ্টিতে আটকে গেছি। ছাতাটাও ঘরে ফেলে এসেছি।"
"তা বেশ করেছিস। ছাতা সচরাচর লোকে ঘরেই ফেলে রেখে যায়, বিশেষ করে বৃষ্টি বাদলার দিনে।"
"ছ্যাবলাস না, পুরো কথাটা শোন আগে। অনিরুদ্ধদা ফোন করে ছিল, ট্রেন গোকুলপুর স্টেশন ছেড়েছে, আর কিছুক্ষনের মধ্যেই মেদিনীপুরে ঢুকবে। তুই চট করে গাড়িটা বার কর। স্টেশন যাওয়ার পথে বাজারে আমাকে পিক আপ করে নিস। আমি নান্টুদার দোকানের সামনে থাকব।"
"ঠিক আছে" বলে স্বর্ণেন্দু ফোন রাখল।
এখন যতক্ষণে স্বর্ণেন্দু গাড়ি বের করছে, ততক্ষণে পরেশ ও অনিরুদ্ধের পরিচয় দেওয়া যাক। পরেশ মাইতি, স্থানীয় স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক, বাড়ি বাগনান। আর অনিরুদ্ধ গাঙ্গুলি ব্যাঙ্গালোরে চাকরিরত, বাড়ি উত্তরপাড়া। এক অনিরুদ্ধ বাদে বাকি তিনজন থাকে সেই তিন কামরার ফ্ল্যাটে। অনিরুদ্ধ বাড়ি ফিরেছে ছুটি নিয়ে, তাই দিন দুইয়ের জন্য মেদিনীপুরে আসছে ফুর্তি করতে।
স্বর্ণেন্দু তার কালো রঙের হুন্দাই ক্রেটা গাড়িটা নিয়ে স্টেশন রোড হয়ে মেদিনীপুর রেলস্টেশন পৌঁছোয় প্রায় আধঘন্টা পরে। এতো সময় লাগার কারণ আর কিছুই না, স্টেশন রোডের যানযট। তার উপর পরেশকে নিতে বাজারের দিকে যেতে হয়েছিল। সেই জন্য পরেশের উপর খানিক চটেও ছিল স্বর্ণেন্দু। কিন্তু পরেশের কেনা মাছ খানা দেখে সেই রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। না মাছটা ঠিক পরেশের সাইজের না হলেও বেশ বড়।

স্টেশনের বাইরের চত্তরে অনিরুদ্ধ একটা পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলো। পরেশ দেখতে পেয়ে হাঁক ছাড়ল।
পরেশ: "ও অনিরুদ্ধদা, এদিকে!"
"তোরা তাহলে এলি শেষমেশ। আমি ভাবলাম স্বর্ণের গাড়ি আবার পাংচার হয়ে গেল নাকি।" গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল অনিরুদ্ধ।
স্বর্ণেন্দু: "বৃষ্টি বাদলার দিনে লোকের ব্যস্ততা বেড়ে যায়, জান না?"
অনিরুদ্ধ: "তাই নাকি?"
স্বর্ণেন্দু: "আজ রবিবার, উপরন্তু সকাল থেকে বৃষ্টি এবং বাজারে বড়ো বড়ো ইলিশ উঠেছে। আর কিছু বলতে হবে?"
অনিরুদ্ধ: "বুঝেছি। তা সেই ইংলিশের কিঞ্চিত দেখা কি আজ মিলতে পারে?"
পরেশ: "কিঞ্চিত দেখা? গোটা খানাই দেখতে পাবে। এই শর্মা যখন আছে ভয় নেই। সকাল সকাল গিয়ে ঠিক মেছো বিড়ালের মতো একখান পাকড়াও করেছি, হুম।"
স্বর্ণেন্দু: "বেশি বকিসনি। সকাল সকাল গিয়ে একখান মাছ কিনতে বাবু বেলা গড়িয়েছেন।"
পরেশ: "আরে ঐ ছাতা..."

অনিরুদ্ধ: "ব্যাস্। অনেক হয়েছে। আচ্ছা, নরেন কখন ল্যান্ড করছে?"
স্বর্ণেন্দু: "নরেনদার আসতে বিকেল হবে। ও আসার সময় অফ্ সপ্ থেকে রেড লেবেলটা নিয়ে আসবে। এখন গিয়ে চট করে মাছটা রেডি করে নিতে হবে। উফ্! চীন্তা করেই জিভে জল চলে আসছে।"

ফ্ল্যাটে ঢুকে সকলে খানিক বিশ্রাম নিয়ে লেগে পড়ল দাওয়াতের আয়োজন করতে, ঠিক পুরানো দিনের মতো। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কি করে এদের মধ্যে যোগাযোগটা হল, কারণ এক একজনের বাড়ি এক এক প্রান্তে। না, সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো অবদান নেই এক্ষেত্রে। আসলে এরা পূর্বে পড়াশোনা সূত্রে এসেছিল মেদিনীপুরে। এসে উঠেছিল মফস্বলের এক মেসবাড়িতে। তারপর বহুবছর কেটে গেলেও বন্ধুত্বে ইতি ঘটেনি। প্রায় বছরই অনিরুদ্ধ ও নরেন, ওরফে নরেন বিশ্বাস, সময় করে চলে আসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। এইবারও ঠিক তাই।

দুপুরে গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা, লাবড়া, আলুর দম ও পাঁপড় সহযোগে খিচুড়ি খেতে বসল সকলে। বাইরে তখন ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে।
ইলিশের কাঁটা বাছতে বাছতে স্বর্ণেন্দু বলল,"না পরেশ, মাছখানা তুই জম্পেশ আনছু। নে তোর এ জন্মের দোষ ক্ষমা করে দিলাম।"
পরেশ: "পাপের বোঝা নিয়ে, এসেছেন ক্ষমা করতে।"
স্বর্ণেন্দু: "অ্যা? কিছু বললি?"
পরেশ: "না কিছু না। অনিরুদ্ধদা বিকেলে বেরোবে তো?"
অনিরুদ্ধ: "অবশ্যই। আরে আমি কি ঘরে বসে থাকার জন্য এসেছি? তা কোন দিকে যাওয়া হচ্ছে?"
মনোরঞ্জন: "ভাদুতলার দিকে গেলে কেমন হয়? এই বৃষ্টিতে ভাদুতলা জঙ্গলের রাস্তা কেমন দেখতে লাগে তোরা তো জানিস। দুই পাশে ঘন সবুজের দেওয়াল, মাঝে ভেজা কালো পিচের রাস্তা, উপরে মেঘলা আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি। আহা!"
অনিরুদ্ধ: "হ্যাঁ, সেই ভালো। ভাদুতলাই চল। ফেরার সময় কর্ণগড়ের মন্দিরও ঘুরে আসা যাবে।"
এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি দিলে। সেইমত খাওয়া দাওয়ার পর্ব সাঙ্গ করে, খানিক বিশ্রাম নিয়ে, গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল চারজনে। ঘুরে আসতে আসতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ফ্ল্যাটে ঢুকেছে যখন, তখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে সাতটা ছুঁই ছুঁই। নরেনের আসার সময় হয়ে গেছে। আরো মিনিট কুড়ি পরে এল নরেন, সাথে পুর্ব পরিকল্পনা মাফিক রেড লেবেলের বোতল।
"এই যে, আসল লোকটা এবার এসে পড়েছে, এবার খেলা শুরু হবে। আহা সকাল থেকে কিছু একটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল, এবার সেটা পূরণ হয়ে গেল।", বলেই খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠলো অনিরুদ্ধ।
নরেন: "ঢং করতিছু? সত্যি করে বলতো, 'লোকটা'র কথা বলতিছু নাকি 'জিনিসটা'র?"
অনিরুদ্ধ: "এই না, মানে ইয়ে, মানে-"
নরেন: "থাক্ অনেক নাটক দেখাইছু। এমনিতেই ইলিশের ভাগটা ফসকে গেছে।"
মনোরঞ্জন: "কে বলেছে ফসকেছে?"
নরেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "ফসকায়নি বলতিছু?"
স্বর্ণেন্দু: "আসল খেলা তো রাতে, দুপুরে তো ট্রেলার ছিল মাত্র।"
মনোরঞ্জন: "সব হবে, নরেন তুই আগে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে।"

রাতে ইলিশ মাছ ভাজা, রেস্টুরেন্ট থেকে আনা কাবাবের সাথে রেড লেবেলের বোতলটা নিয়ে এল অনিরুদ্ধ ও মনোরঞ্জন। তারপর যা হয় আর কি। পেগের পর পেগ গলাধঃকরণ করার সঙ্গে চলতে থাকল আড্ডা।
মনোরঞ্জন বলল, "ইস্! পাশের ঘর থেকে খাতাটা নিয়ে আসলে ভালো হয়।"
পরেশ: "কেন?"
মনোরঞ্জন: "এই অনিরুদ্ধটার পেটে জল পড়লে তো ঋষির মতো বাণী দিতে শুরু করে। কি জানি এমন কিছু একটা হয়তো বলে দিল, পরে খেটে গেল।"
এই কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলো।
স্বর্ণেন্দু: "তা যা বলেছ। সেরকম হলে ভয়েস রেকর্ড করে রাখছি।"
নরেন: "কি রে অনিরুদ্ধ, কিছু বলতিছু নি। চুপচাপ আছু।"
অনিরুদ্ধ: "আরে না রে, কিছু না, আসলে মনেহচ্ছে আজ একটু বেশি চড়ে গেছে।"
মনোরঞ্জন: "ওই ভাবে খেলে চড়বে না? আজ কিছু একটা হয়েছে তোর। সত্যি করে বল তো।"
অনিরুদ্ধ: "আরে কিছু হয় নি রে। তোরা নেশায় ভুলভাল ভাবছিস।"
স্বর্ণেন্দু: "তুমি যখন বলছ, তাই হবে।"

পরের দিন ছুটি নিয়েছে সকলেই। তাই, বেশ রাত্রি পর্যন্ত ওরা ফুর্তি করে ঘুমিয়ে পড়লো। পরেরদিন বেশ বেলা করে যখন মনোরঞ্জন উঠলো, তখন ৯ টা বেজে গেছে। সকলকে তাই সে ডাকতে গেলে, দেখে অনিরুদ্ধ নেই। অবশ্য এতে অবাক হল না মনোরঞ্জন। অনিরুদ্ধ আগের দিনই বলেছিল যে, সে ভোরের ট্রেনে কোলকাতা ফিরবে।

বিস্ফোরণটা হল দুপুরে। দুপুরে খাবার সময় স্বর্ণেন্দু খবরের চ্যানেলে ঘোরাতেই শিরোনামে একটা খবর চোখে পড়লো। মেদিনীপুরে কংসাবতী নদীর উপর, রেলওয়ে ব্রীজের আগে একজন রেলে কাটা পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ভোরবেলা, পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে। ঠিক গলা থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে। পুলিশের অনুমান এটি একটি আত্মহত্যা। মৃতব্যক্তির সাথে যেসব জিনিস সংগ্রহ করা হয়েছে, সেইখান থেকে মৃতর পরিচয় ও ঠিকানা পাওয়া গেছে। মৃতব্যক্তির নাম অনিরুদ্ধ গাঙ্গুলী।

ঘটনাটির বেশ কিছুদিন পর, স্বর্ণেন্দু কলেজে লাঞ্চের সময়, ল্যাপটপ নিয়ে বসেছিল। কিছু করছিল না, শুধু ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে। বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল অনিরুদ্ধদার মুখটা। সেদিন টিভিতে খবরটা দেখার পর থানায় ছুটে গেছিল তারা। তারপর সেখান থেকে তাদের মর্গে নিয়ে যাওয়া হলে, অনিরুদ্ধদার মুখটা চিনতে কোনো অসুবিধা হয়নি। নরেন তো সেইখানেই জ্ঞান হারায়। পুলিশি তদন্ত শেষ হলে, সংগৃহীত বহু তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটিকে আত্মহত্যা বলে ধরে নেওয়া হয়।

অনিরুদ্ধ বেঙ্গালুরুতে যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিল, সেটি দেউলিয়া হয়ে যেতে, স্বাভাবিক ভাবেই তার চাকরিটা যায়। এদিকে অনিরুদ্ধ আর তার স্ত্রীর সম্পর্কও খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। চাকরি যাওয়াতে যেন সেই আগুনে ঘি পড়ল। অতএব, সেই আগুনে পুড়লো সংসার, হয়ে গেল বিবাহবিচ্ছেদ। গত চার বছরের বিবাহিত জীবনের ইতি। অনিরুদ্ধের বাবা মা পূর্বেই গত হয়েছেন, তার উপর এই দুইয়ের ধাক্কা অনিরুদ্ধ নিতে পারেনি বলেই পুলিশের অনুমান। তবে স্বর্ণেন্দুদের তা বিশ্বাস হয়না। কি করে একটা হাসিখুশি মানুষ তাদের সাথে একসাথে বসে ফুর্তি করল এবং সকাল হতেই আত্মহত্যা করল! সত্যি মানুষের মন বোঝা বড়ই দুর্বিষহ।

- গল্পটা বলা শেষ করে অনিমেষ তাকাল বাকিদের দিকে। চেষ্টা করল সকলের মনের ভাব বুঝতে পারার।
“তা বল, কেমন লাগল?”
স্বরণদীপ বলল, “খারাপ না। তবে-”
অনিমেষ: “তবে কি?”
স্বরণদীপ: “একজন মানুষের ওইরকম মনের অবস্থা, তবুও মুখে হাসি নিয়ে সকলের সাথে আড্ডা দিল, পুরো একটা দিন একসাথে থাকল, অথচ কেউ বুঝতে পারল না? এটা অবাক লাগছে না?”
মনোহর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, “ঠিক বলেছিস। এটা বিশ্বাস করা যায় না। এইযে, আমাদের নবীনের সাথে যদি আমাদের বৌদির কোনো ঝামেলা বাঁধে, তাহলে আমরা কি তা, তার মুখ দেখে বুঝব না?”
“গতকাল পিয়ালীদির সাথে ঝামেলা করে এসেছ, তা কি আমরা জানি না ভেবেছে?” রেড লেবেলের লাস্ট পেগ টুকু গলাদ্ধকরণ করে বলল নবীন।
মনোহর নবীনের দিকে একখান অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।
প্রহ্লাদ, মনোহরের দিকে হুইস্কির গ্লাসখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “আরে মনোহরদা বাদ দাও, দাম্পত্য জীবনে দাম্পত্য কলহ হবে না, সেটা আবার হয় নাকি!”
নবীন খিঁচিয়ে উঠে বলে, “শোন, বেশি পন্ডিতেমী ফলাসনি। বিয়ে তো আর করিসনি যে বুঝবি।”
স্বরণদীপ: “জনগণ, সকলের উদ্দেশ্যে বলি, আমরা ক্রমশ বিপথে চালিত হতেছি। জাতির উদ্দেশে আমার অনুরোধ, আমরা যেন বিপথে চালিত না হই।”
মনোহর: “যেটা বলছিলাম, একটা মানুষের মনের ভাব কোনো না ভাবেই, তার হাবভাবে প্রকাশ পাবেই, আমার অন্তত তাই মনে হয়।”
স্বরণদীপ: “অনিমেষদা, কার লেখা?”
অনিমেষ: “মনে নেই রে, কোথায় যেন একটা পড়েছিলাম।”
প্রহ্লাদ: “ওসব বাদ দাও, এদিকে ইলিশের পাতুরিটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। ও-নবীনদা পেগটা বানাও জলদি।”
অনিমেষ: “ইলিশটা কিন্তু জম্পেশ হয়েছে।”
প্রহ্লাদ: “দেখতে হবে না কে এনেছে!”
অনিমেষ: “কোথায় পেলি?”
প্রহ্লাদ: “গতকাল মেদিনীপুরে আসার সময় কোলাঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসেছি।”
স্বরণদীপ: “প্রহ্লাদ টা আর কিছু পারুক আর না পারুক এই কাজটা ভালো পারে।” - ব্যাস্ এইটুকুই ডাইরির শেষ লেখা। এরপর কি হয়েছিল তা অবশ্যই অনেকেই জানেন। কারণ সেই সময় ঘটনাটি বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল খড়গপুর সহ বেশ কিছু জায়গায়। ডাইরির লেখা গুলো পড়ে মনে হতেই পারে, লেখাটা গল্পের মতো। কে ডাইরির লেখক তা পড়ে বোঝা যাচ্ছে না। সাধারণত ডাইরি এভাবে লেখা হয় না, হয়ত সেই দিক থেকেও এটি আরও অদ্ভুত। ডাইরির মালিক অনিমেষ মিত্র, হ্যাঁ, সেই ‘অনিমেষ’, যে কিনা নিজেই ঐ ডাইরির এক চরিত্র, এ’বছর জুলাই মাসের এক রবিবার যার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে খড়্গাপুরের এক বাড়ি থেকে। বাড়িতে সেই সময় আরও চারজন উপস্থিত ছিলেন। অনিমেষের দেহ উদ্ধারের আগের দিন শনিবার, তারা চারজনে একত্রে খাওয়া দাওয়া করেন ও বেশ রাত করে শুতে যান। সকালে একজন অনিমেষকে ডাকতে গেলে, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা হিসাবে অনুমান করা হয়েছিল। পরে সেই অনুমানকে সংগৃহীত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত রূপে গ্রহন করা হয়। সেই ডাইরির কিছু অংশ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে, এবং বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

ডাইরির সেই পাতা গুলো পড়ে মনে মনে হাসল অনিন্দ। 'দেজা ভূ' - একটি ফরাসি শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ - 'আগেই দেখা'। শব্দটি ব্যবহার হয়, যখন কোন ব্যক্তি কোনো এক স্থানে থাকাকালীন অনুভব করে, যে সে সেই স্থান ও পরিস্থিতি আগেই দেখেছে। ডাইরির পাতা গুলোর সাথে যেন এই ফরাসি শব্দটা আন্তরিক ভাবে যুক্ত।

আর্টিকেলটা রেখে অনিন্দ ঘড়ির দিকে তাকাল, বেলা ১০ টা বাজে। আজ তাকে ঝাড়গ্রাম যেতে হবে, এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। প্রসন্ন নাকি পদ্মার ইলিশ পেয়েছে, জম্পেশ খানাপিনা হবে দুপুরে। রাতে আবার জনি ওয়াকারের সাহচর্য লাভ। ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি খেলে যায় অনিন্দর। দরজার পাশে রাখা ব্যাগটা পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে গিয়ে খানিক কম্পনের ফলে টেবিলে রাখা একটা কাগজের টুকরো মাটিতে পড়ে যায়। কি লেখা ছিল সেই কাগজে? সেটা না জানলেও চলবে পাঠকের। তবে সে লেখার শেষ শব্দটি ছিল 'বিদায়'।

ব্রহ্মপুরুষ

- অর্ণব চ্যাটার্জ্জী



তখন রাত্রি বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট মতন। কলকাতার ক্যানিং স্ট্রিটের ভট্টাচার্য বাড়িতে এক শোকের আমেজ ধরে আছে। বাড়ির বড়মায়ের খুব শরীর খারাপ। তিনি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। অনেক ধরনের চিকিৎসার পরেও কোনোরকমের উপায় পাওয়া যায়নি। পাড়ার সকলের মুখে শুনতে পাওয়া যায় বড়মা নাকি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তার স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুর পরে তিনি একা পুরো বাড়িটা সামলেছেন। সংসারের সাথে সাথে তিনি বাড়ির ব্যবসাও সামলেছেন সমান তালে। পাড়ার আশেপাশে যত দুঃস্থ বাড়ি আছে তাদের সন্তানদের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। আবার প্রতি দুর্গা অষ্টমীতে তিনি নিজের হাতে রান্না করেছেন সকলের জন্য। তবে সেই মানুষটা আজ পঞ্চাশ বছরে এসে আর পারছেন না। ডাক্তারবাবু তখন শেষবারের মতন দেখে বাড়ির লোকেদের একবার খবর দিলেন – "বড়মার হাতে আর বেশি সময় নেই। আমি আর কিছু করতে পারবো না। আপনারা বরং এই সময়টুকু উনার সাথে থাকুন। আমি আসি।" এই খবর পেয়ে সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। খবরটা বাড়ির বাইরে যেতেই কেমন একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পরেছে।

এই খবরটা বড়মা বুঝতে পেরেছে। সে জানে তার কাছে আর বেশি সময় নেই। তবুও সে যেন কারোর অপেক্ষা করছে আর তাই জানালার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার মন বলে সে আসবে। তার সাথে একবার শেষ সাক্ষাৎ খুব জরুরী। আর তখনই বড়মার দরজা খুলে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। অত্যন্ত কষ্ট করে বড়মা ওই দিকে তাকিয়ে বলে, "ব্রহ্মপুরুষ, তুমি এসেছ?"

সেই ব্যাক্তি দরজা থেকে বিছানার কাছে এসে বড়মার ডান হাত ধরে বলে, "সখী, আমি এসেছি। তোমার এই রকম খবর পেলাম আর আমি আসব না তাই কি হয়? তোমায় এই অবস্থায় আমি দেখতে পারছিনা। আমার মন খুবই বিচলিত।"

এই কথা শুনে বড়মা শুধু তার দিকে চেয়ে থাকে। তাকে যেন কতদিন দেখেনি। সেই গভীর নীলাভ চোখ দুটো রাতের আঁধারে জ্বলজ্বল করছে। আর তার মাথার ঘন চুল এখনো ওরকমই আছে। তার হাতের স্পর্শ থেকে শুরু করে মুখের মৃদু হাসি, সব একই রকম আছে যেমনটা বড়মার মনে ছিলো। এই রকম ভাবেই দেখতে দেখতে সে এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলে, "আমি তো আর তোমার মতন অমর নই। আমাকে যে এবার যেতে হবে।"

শুধুমাত্র তার দিকে তাকিয়ে থেকে সেই ব্যাক্তি যেন কতো কথা বলে চলেছে। সেই মনের কথাগুলো কি আর বলার সময় আছে? নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হলো তার। আর অনেক ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে সে বলে, "সেটাতো আমার অভিশাপ। তুমি ভালো করেই জানো আমার ভেতরের কষ্ট। সবার মতন তবে তুমিও আমায় ছেড়ে চলে যাবে।"

বড়মা তার শরীরের একদম অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে সেই ব্যাক্তির হাত ধরে বললো, "ব্রহ্মপুরুষ, তোমায় আমার এইভাবে দেখতে ভালো লাগে না। আমার আর শক্তি নেই। খুব ক্লান্ত লাগছে। আমি তো তোমার স্মৃতির মধ্যে চিরদিনই বেঁচে থাকবো। তাদের মতন আমিও তো তোমার এক অংশ।" এই মুহূর্তে সেই ব্যক্তির চোখে জল চলে এসেছে। তার গলা ভারি হয়ে আসছে। এই মুহূর্তে বড়মা বলে ওঠে, "তোমায় কাঁদতে দেখলে যে আমার ভারি কষ্ট হয়। তুমি আমায় প্রতিবারের মতন একটা গল্প বলো না? আমি আবার সেইদিন গুলো মনে করতে চাই। তোমার স্মৃতি দিয়ে আমি আরেকটু বাঁচতে চাই।"

সেই ব্যক্তি নিজের চোখের জল মুছে দিয়ে একটু উজ্জ্বল চোখে বলে, "সখী, কী গল্প শুনবে বলো? আমার কাছে গল্পের শেষ নেই। সেই দু'হাজার বছরের গল্প আমার কাছে আছে।"

বড়মা বলে, "পুরোটাই বলো ব্রহ্মপুরুষ। আমি সবটা শুনতে চাই। তোমার বাড়ি কথায়? তুমি এই ব্রহ্মপুরুষ নাম পেলে কথায়? আমি সবটা জানতে চাই। আমার তো ইচ্ছাও ছিলো মহাকাশ ভ্রমণ করার কিন্তু আর তো সময় নেই।"

সেই ব্যক্তি বলে, "আচ্ছা বেশ। তোমার মহাকাশ যাত্রার ইচ্ছা যখন পূরণ করতে পারলাম না তাহলে আমার গল্পেই তোমাকে আমার দু'হাজার বছরের জীবন ভ্রমণ করাই।"

তোমাদের মিল্কিওয়ের কাছেই আরেকটা গ্যালাক্সি পড়ে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছে অ্যানড্রোমেডা। আমি সেখানকার খনশু গ্রহের বাসিন্দা। আমরা পৃথিবীর মানুষের মতন এতোটা জটিল নই। আমাদের জন্ম হয় মাটির মধ্যে দিয়ে আর আমাদের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গেলে আমরা মাটিতেই আবার মিশে যাই। আমাদের উদ্দেশ্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের সন্ধান করা। আর তাই আমার যাত্রা শুরু হয় মার্স-এর পথে। কিন্তু মাঝপথে আমার জাহাজ খারাপ হয়ে গিয়ে আমি এসে পড়ি এই পৃথিবীতে। তখন আমি ভারি ভয় পেয়ে ছিলাম। তোমাদের ভাষা জানা ছিলনা। তোমাদের মতন দেখতে নই বলে আমাকে সবাই ভয় পেতো। আমাকে কতজন ঢিল মেরেছে আবার আগুনের মশাল দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। কয়েকজন তো আমায় ধরে নেওয়ার চেষ্টাও করেছে কিন্তু পারেনি। আমি তোমাদের ভাষা শিখলাম এক রোমান দাসী অরোরার কাছ থেকে। কিছু মানুষ তাকে এক নদীর ধারে ফেলে দেয় আর প্রাণ থাকাকালীন আমি তার কপালে হাত দিয়ে তার রূপ ধারণ করে নিই। তারপর আমি আলেক্সান্দ্রিয়ায় চলে যাই আর সেখান থেকেই জানতে পারি তোমাদের সাহিত্য,

সংস্কৃতি সম্পর্কে। কিন্তু এক জায়গায় আমি থাকতে পারতাম না। আমায় বিভিন্ন রূপ নিতে হয়। কত শহর, কত মানুষ, কত চেহারা, কত ইতিহাস – সব নিয়ে আমি ভ্রমণ করতে থাকি। কত ঘটনার সাক্ষী হয়েছি আমি। আমার চোখের সামনে রোম দাউদাউ করে জ্বলেছে আর ওই পাগল রাজা নিরো বাজনা বাজিয়েছে। সেই কতো জাতির উত্থান আর পতন দেখলাম কিন্তু বাড়ির সাথে কোনো যোগাযোগ করতে পারলাম না।

তারপর আমার দেখা হয় আফসানার সাথে। পার্সিয়ার এক রাজকুমারীর প্রধান দাসী। আফসানা আমায় প্রথম শেখায় প্রেম কাকে বলে। আমার গ্রহে এই প্রেম বিষয়টা খুব তুচ্ছ চোখে দেখা হয় কিন্তু আফসানার সাথে যে সময়টুকু কাটিয়েছি তাতে আমার অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়। তবে আমার প্রকৃত পরিচয় জানার পরে, আফসানা আমার থেকে দূরে চলে যায়। সে যেন করিমকে পছন্দ করবে কিন্তু খনশু গ্রহের এক বাসিন্দাকে কাছেও ঘেঁষতে দেবেনা। তখন খুব দুঃখ পেয়েছিলাম কিন্তু এখন এই বাস্তবটা বুঝি। তার মৃত্যুশয্যায় আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম আর আমায় দেখে সে ভয় পেয়ে একদম স্থির হয়ে পড়ে। আমি খুব দুঃখে চলে গেলাম আমার ভ্রমণে। পার্সিয়া থেকে মিশর আর তারপর আবার এসে পরলাম আলেক্সান্দ্রিয়াতে। তখন দেখি আমার জাহাজ আর ওখানে নেই! আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই। বাড়ি ফিরবো কি করে? আমার কাছে শুধু একটা রিমোট ছিলো যাতে করে আমি বাড়িতে সংযোগ করতে পারতাম আর ওই জাহাজকেও খুঁজে পেতাম। কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট শক্তি ছিলো না। কিছু সন্ধানের পর আমি খবর পাই অভিবরধনের আর তার সন্ধানে আমি আসি তখনকার ভারতবর্ষে। সেই সময় অত্যন্ত মনোরম। ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র অভিবরধন আমার অনেক সাহায্য করে। আর সেই সাহায্য থেকেই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আসে আর অভিবরধনের সাথে আমার বিবাহ হয়। অভিবরধন জানতো আমি এই গ্রহের নই তবে সে কিন্তু কখনই ভয় পায়নি। তার মধ্যে এক অদ্ভুত ইচ্ছা ছিলো আমাকে নিয়ে। সারা পৃথিবীতে তখন শুধুমাত্র অভিবরধনই আছে যে এই রকম আধুনিক বিজ্ঞানে পারদর্শী। আমার রিমোটে উপযুক্ত শক্তি পাওয়ার পরেও আমি আমার সন্ধানে ফিরে যেতে পারিনি। ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আর সেই ভালোবাসা থেকেই আমি দুই সন্তানের জন্ম দিলাম – সরস্বতী আর আদিত্য। কিন্তু পৃথিবী আর খনশুর বাসিন্দাদের মধ্যে প্রজনন সম্ভব না। পৃথিবীর সবাই মরণশীল। অভিবরধনকেও মৃত্যুর কবলে চলে যেতে হয়। মৃত্যুর সময় তার রূপ নেওয়ায় আমায় অভিবরধন বলে, "তুমি সাধারণ নও। তুমি ব্রহ্মপুরুষ। তুমি সেই ব্রহ্ম।" আর এই বলে অভিবরধন চুপ করে যায়।

আমি রিমোটের সাহায্যে আমার জাহাজ খুঁজে পেলাম ইতালিতে। তখন বাইজেনটিয়াম যুদ্ধ করছে আর সেই যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছিলো আমার গ্যালাক্সির এক অন্য গ্রহের বাসিন্দা। তাদের জাতির নাম টারগেরিয়ান। তাদের কাজ সব সময়ের সমান্তরালতা বজায় রাখা। আমার জাহাজের আধুনিকতা মানুষের কাছে নাকি বিনাশকারী হতো। তাই তারা সেটা বাজেয়াপ্ত করে নেয় এবং আমাকে দেখার পর আমাকে নিজেদের বন্দী করে নেয়। প্রায় এক হাজার বছর আমাকে এক অন্ধকার ঘরে থাকতে হয়। সেই অন্ধকার ভয়ঙ্কর। এতোটাই নিস্তব্ধ, এতোটাই নির্জীব যে আমার বারংবার ইচ্ছা হতো মাটিতে মিশে যেতে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পূরণ না হলে আমার যে মৃত্যু নেই। টারগেরিয়ানরা আমায় ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় জর্জরিত রেখেছিলো কিন্তু আমার শরীর সেটা অনুভব করতেই পারেনি। প্রায় এক হাজার বছর পর আমার মুক্তি হয়। টারগেরিয়ানরা চলে যায় নিজেদের গ্রহে – তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। আমার জাহাজ ফিরে পেলাম আর সেখান থেকেই খনশুতে খবর পাঠালাম। আমার সব অভিজ্ঞতা জেনে খনশু আপ্লুত, আমি নাকি খুবই মূল্যবান তথ্য তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমাকে আদেশ দেওয়া হয় ফিরে আসার কিন্তু আমি ওই হাজারটা বছর অন্ধকারে থাকার পর সব শেষ করতে চাইনি। আমি খনশুর আদেশ অমান্য করে থেকে যাই পৃথিবীতে। আমি

পৃথিবীর আরও মানুষ দেখতে চেয়েছিলাম, আরও সৌন্দর্য দেখতে চেয়েছিলাম। আরও তথ্য জোগাড় করার নামে থেকে গেলাম। আমার জাহাজ লুকিয়ে চলে গেলাম পুরো রোমের শিল্প অনুভব করতে। ওই অন্ধকারে থাকাকালীন ঘটে যাওয়া সব ইতিহাস পড়লাম আর সেই সূত্রেই দেখা হলো আমার লেওনারডোর সাথে। অসম্ভব প্রতিভা তার। সে আমার জাহাজের পুরো ব্যাপার বুঝে সেটা সারিয়ে দেয়। আমার জাহাজ দেখে নিজের তত্ব আবিষ্কার করে। তার সাহায্যে আমার জাহাজ আবার মহাকাশে ফিরে যায় আর যদি আমায় সেই জাহাজে যেতে হয় তাহলে ওখান থেকে একটা বাজ পড়ে আমার ওপর আর আমি সেখানে ফিরে যাই। এর ফলে আমার যাত্রা অনেক সুবিধার হয়ে যায় কিন্তু ওই বিনা মেঘে বজ্রপাত পৃথিবীর মানুষের কাছে সাধারণ বিষয় ছিলো না, তাই আমি বারংবার তা ব্যবহার করতেও পারতাম না।

তখন আমি এক পরিচয় নিয়েছিলাম ম্যাডাম রোজা বার্লির। সেই পরিচয় নিয়ে আমি একদিন ইংল্যান্ডে, একদিন ফ্রান্সে, আবার আরেকদিন স্পেনে ভ্রমন করেছি। কত মানুষ, কত অভিজ্ঞতা, কত শিল্প। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে ওই থিয়েটারে ওথেলো দেখার অভিজ্ঞতা। তারপর আরও কতো নাটকই না দেখেছি। বসে বসে দেখেছি সবার মাঝে কিভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমি নিজের চোখে চার্লসকে ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে দেখেছি। জন মিল্টনের সাথে আন্দোলন করেছি। সব দলের হয়ে লড়াই করেছি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য। ওই সময়টাই অন্যরকম। পরিবর্তন আর প্রগতি খুবই দ্রুত গতিতে হয়েছে। আমার সামনেই একবার ইংল্যান্ড পুড়েছে। সেই দৃশ্য বর্ণনার বাইরে। কতো জীবন একসাথে চলে গেলো। সেই সময় আমি আমেরিকাও ভ্রমন করেছি। বুঝলাম মানুষ কিভাবে নিজেদের ওপরই রাজত্ব করতে চায়। পুরাতন সেই দাস প্রথা আবারও দেখলাম আর সেই কালো চামড়ার মানুষগুলোর খোঁজ করতে করতে পৌঁছলাম আফ্রিকায়। সেখানে আমার নতুন পরিচয় কর্নেল লকউড আর বোঁবোঁর। লকউড হিসেবে আমি দাসদের চালনা করার অভিজ্ঞতা পাই আর বোঁবোঁ হিসেবে আমি আবার এক নতুন সংসার করার চেষ্টা করি। এই পৃথিবীতে থাকতে থাকতে আমিও যে তোমাদের মতই হয়ে গেছি। খনশুদের মনে প্রেম, একাকীত্ব, আনন্দের কোনো চিহ্ন নেই। অনেক জায়গায় আমার পরিবার তৈরি করার চেষ্টা করি কিন্তু সবই বিফল হয়ে পরে। আমার এখনো মনে আছে ওই ফ্রান্সের বিপ্লবের কথা। এত মানুষের মধ্যে লড়াই করেও যেন আমি একা। আমি তারপর কয়েক বছর প্যারিসেই থাকি। প্রত্যেকদিন বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন জনের সাথে থাকতে শুরু করলাম কিন্তু মনের ভিতরটা যেন খুব ফাঁকা মনে হতে লাগলো। মনে হয়েছিল আমার উদ্দেশ্য শেষ। বোকা রাজা আর রাজনীতি ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। তাই ভাবলাম চলে জাওয়ার আগে একবার শেষবারের মতন পুরো পৃথিবীটা দেখে যাবো।

হারিয়ে যাওয়া শহর থেকে শুরু করে নিজের চেহারা বদলে ফেলা শহর – সবটা দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলাম আবার এই ভারতবর্ষে। তখন এই দেশ ইংল্যান্ডের শাসনের অধীনে। আমি শুধু বসে বসে দেখলাম – বিশ্বাসঘাতকতা, বলিদান, স্বাধীনতা। যত তথ্য ছিলো সবটাই এবার নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময়। ঠিক তখনই আমার পরিচয় হয় তোমার মায়ের সাথে। শ্রীজাকে আমি ভুলতে পারবোনা কোনোদিনই। তার সাথে সংসার করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে আমায় কখন ভালোবাসেনি। তখন আমি রূপ নিলাম এক বিদেশী সাহেবের আর নিজের নাম রাখলাম ব্রহ্মপুরুষ। কিন্তু সে আমায় ফিরিয়ে দেয় আবারও কারণ তার মন পড়েছিলো অরুণাভর কাছে, তোমার বাবার কাছে। আমার একাকীত্ব শ্রীজা এসে ভরিয়ে দেয়। আমি খনশুর এক ব্যর্থ বাসিন্দা হয়ে পড়ি যার মধ্যে প্রেমের ভাব জেগেছে। খুব পছন্দ ছিলো শ্রীজার প্রত্যেক বিকেলে আমার সব গল্প শোনার। তারপর শ্রীজার বিয়ে হয়ে যায় আর আমি তোমাদের বাড়ির এক অতিথি হয়ে থেকে যাই। জানিনা তোমার মনে আছে নাকি তোমার ছোটবেলায় তোমার সাথে অনেক খেলেছি। তারপর আবার তথ্য সংগ্রহ করতে আমায়

চলে যেতে হয়। কিন্তু ফিরে এসে জানতে পারি শ্রীজা আর নেই। তার এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে যে নাকি অবিকল শ্রীজার মতন দেখতে।

বড়মা তখন এক আনন্দদায়ক হাসি নিয়ে বলে, "বাকিটা আমি বলি? দেখি আমার স্মৃতিতে কতটা ধরে রাখতে পেরেছি।" সেই ব্যাক্তি চুপ করে যায় আর ঠিক এক তীর্থের কাকের মতন বড়মার দিকে চেয়ে থাকে। বড়মা বলে, "তারপর যাদবপুরের বাইরের ওই চায়ের দোকানে তুমি হঠাৎ করে আমায় দেখা দিলে। আমি খুব চমকে গিয়েছিলাম। তোমায় চিন্তে পারিনি। তীর্থ তোমায় দেখে ভেবেছিলো তুমি নাকি আমার কোনো পুরনো প্রেমিক। তবে ভাবাটাই স্বাভাবিক – তোমায় দেখে মনে হচ্ছিলো তোমার চব্বিশ বছর বয়স। সেই সুদর্শন চেহারা এখনো ওরকমই আছে। তারপর তুমি আমার বাড়ি আসলে, ভাত খেলে, পুরো সত্যিটা বললে আর আমাদের সাথে থাকতে শুরু করে দিলে। তীর্থ বিশ্বাস করেনি তুমি অন্য গ্রহ থেকে এসেছ। তারপর হঠাৎ করে তীর্থ আমায় ছেড়ে চলে গেলো। পৈত্রিক ব্যবসা আমার ঘারে এসে পড়লো আর তুমি আমার পরামর্শক হিসেবে আমার সাথে থেকে গেলে। ব্রহ্মপুরুষ, তুমি না থাকলে আমি হয়তো আজটা দেখতে পেতাম না।"
সেই ব্যাক্তি বলে ওঠে, "সেটা নয় সখী। শ্রীজার পর তুমি আমায় আগলে রেখেছ। আমিতো সেই দুস্থ মানুষ সেজেও তোমার কাছে এসেছি কিন্তু তুমি আমায় ফিরিয়ে দাওনি। তোমার মধ্যে শ্রীজাকে খুঁজতে এসেছিলাম। কিন্তু তার না থাকায় আমি তোমায় পাই আর আমার দুই হাজার বছরের তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয়। আমি এখন বুঝে গেছি আমাদের সবার সময় সীমিত আর আমাদের উদ্দেশ্য এই সীমিত সময়ে প্রকৃতভাবে বেঁচে থাকা। মুক্তভাবে বেঁচে থাকা। গলা খুলে গান করা। "সেই ব্যাক্তি কিছুক্ষণ বড়মার দিকে তাকিয়ে থাকে আর দেখতে পার তার চোখ দুটো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা বুঝতে পেরে সে বলে, "কিন্তু তোমায় তো আর একা ছেড়ে যেতে পারিনা বলো সখী। তাই একবার শেষ দেখা করতে চলেই এলাম। এই পৃথিবীটার আমি এখন সব দেখে নিয়েছি আর আমার যাওয়ার সময় চলে এসেছে।"
বড়মার মুখে তখন এক তৃপ্তিপূর্ণ হাসি। খুব রুগ্ন গলায় বলে ওঠে, "আমি তোমার জন্য খুব খুশি ব্রহ্মপুরুষ। তুমি ভালো থেকো। সাবধানে যেও। আমিও আসি।"
সেই ব্যাক্তি বড়মার হাত চেপে ধরে বলে, "দাঁড়াও সখী। এখনো আরও গল্প আছে। আমিতো তোমায় আমার রাশিয়ার গল্প বলিনি। এখনো আমার জাপান ভ্রমণের গল্প বলা বাকি আছে। তুমি কি জানো..." এই কথা শেষ করার আগেই সেই ব্যাক্তি বুঝতে পারে ওই হাতের মুঠো শিথিল হয়ে পরেছে। যে হাত এত মানুষকে প্রাণ দিয়েছে সেই হাতে আর প্রাণ নেই। সেই ব্যাক্তির চোখ ভর্তি অশ্রু। সে নিজের মনে মনেই বলে, "তাহলে এটাই হল সেই বিষাদ ভাব। আমার উদ্দেশ্য এখানে শেষ। আমায় এবার ফিরে যেতে হবে।"
বড়মার হাতটা খুব যত্নে রেখে সেই ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো। বাড়িতে সবাই তখনও চিন্তায় আছে বড়মা না থাকলে কি হবে। এই সময়েই সেই ব্যক্তি ছাদে চলে যায় আর এক বজ্রপাতের শব্দে সবাই চমকে ওঠে।

মা আসছেন, মা কি সত্যিই আসছেন

- অনিরুদ্ধ মহাপাত্র

ছোট্ট রেল স্টেশন নফরগঞ্জ। স্টেশনের বাইরে একটা চা কাম ভাতের হোটেল আর খানকতক রিকশা। স্টেশনের সামনের কংক্রিটের রাস্তাটা সামনেই একটা মোড় ঘুরেই অদৃশ্য হয়েছে। তারপর থেকে বাকি নফরগঞ্জের রাস্তা এখনও সেই লাল মরামে ঢাকা। খুব বড় কেউ একটা স্টেশনে আসেও না, তাই স্টেশন হয়েও রেলের তরফে তেমন কোন গরজ দেখানো হয়নি। ভারত-বাংলাদেশ বর্ডারে বলতে গেলে এটা শেষ স্টেশন। সারাদিনে যাতায়াত মিলে মাত্র একটা লোকাল। নফরগঞ্জ-এর অর্ধেক পড়ে ভারতে আর কিছুটা পড়ে বাংলাদেশে। দুই দেশের মাঝে যেদিন কাঁটা তার টানা হয়েছিল, সেদিনই গ্রামের তৎকালীন কিছু পরিবার ভাগ্য ফেরানোর আশায় রেলে চেপে শহর কলকাতায় পাড়ি দিল। কয়লার রেলের ধোঁয়ার সাথে ধীরে ধীরে তাদের মানসপট থেকে আবছা হতে লাগল ছোট্ট এই গ্রামটা। সময়ের সাথে সাথে ভারতে বিদ্যুৎবাতি ছড়িয়ে পড়লেও, এই গ্রামে এখনো হ্যারিকেনই ভরসা। শহরে ব্যবসা করে যে কয়েক ঘরে গান্ধীজীর মোটামুটি বসবাস ভালো, তারা অবশ্য সোলার দিয়ে আলো করেছে তাদের ঘর। তবে সেই আলোতে নফরগঞ্জে রাতের অন্ধকার দূর হবার জো নেই।

একদিন ভোরে স্টেশনের পাশে ছোট্ট ঝুপড়ি চায়ের দোকান টা খুলতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে নফরগঞ্জের রামু। ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। দোকানের ঠিক পেছনে একটা ছোট মত ডোবা, তার ওপারে হোগলার জঙ্গল। আওয়াজটা সেখান থেকেই আসছে। একসাথে অনেক কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ। অজানা একটা ভয়ে হাতের লন্ঠনটা ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই উঁচিয়ে ধরে রামু। অল্প আলো-আঁধার এসে দেখে একটা ছায়া মূর্তি প্রথমে হোগলা বন থেকে রেললাইনের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর আশ্বিনের কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ যেন মিলিয়ে গেল। রামু লন্ঠন ফেলে রাম রাম চিৎকার করতে করতে ছুটে পালালো গ্রামের রাস্তা ধরে।

সেদিন সকালে গ্রামের লোকজন হোগলা বন থেকে উদ্ধার করল একটা মেয়ের অর্ধনগ্ন মৃতদেহ। শরীরে কাপড় প্রায় নেই বললেই চলে। গ্রামের মেয়ে-বউরাই কেউ শাড়ি একখানা দিয়ে ঢেকে দিল শরীরটা। গ্রামের মাতব্বর গোছের লোকেরা যখন ঝুঁকে পড়েও চিনতে পারল না মেয়েটাকে, তখন তারা পুলিশে খবর দিল। দিনের একমাত্র ট্রেনে পুলিশ এল, ডাক্তার এল। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রামের লোকেদের জেরা করে দু তিন ঘন্টা পর ফের ওই ট্রেনেই ফিরে গেল তারা। পুলিশের ধমকের চোটে রামু তো হাউ হাউ করে কেঁদেই ফেলেছিল। ব্যাস তারপর সন্ধ্যায় পাড়ার মাতব্বরের বাড়ির উঠানে পাড়ার পুরুষরা বসে পুলিশ - কোর্ট এসবের ব্যাপারে বেশ কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত আলোচনা করলো। ঠিক হলো কাল থেকে রামুর সাথে পাড়ার দু- তিনজন ছোকরা দোকান খোলার সময় যাবে।

ঘটনার এক সপ্তাহ বেশ ভয়ে ভয়েই কাটলো সবার। গ্রামের একমাত্র দূর্গা পূজার প্যান্ডেলের খুঁটিপুজোর দিন ঘটল রক্তহিম করা ঘটনাটা। সেদিন বিকালে বেশ খোস মেজাজে গ্রামের এক ছোকরা রেললাইন ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চিৎকার করে স্টেশনের দিকে দৌড় লাগালো। স্টেশন মাস্টার তখন ভগ্ন প্রায় বেঞ্চে বসে রেলের কি সব কাগজপত্র দেখছিল। পুরু চশমার কাঁচ সরিয়ে, হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো প্লাটফর্মের দিকে।

একটা ছেলে উন্মাদের মতো তারই দিকে দৌড়ে আসছে। তিনি কাগজ ফেলে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। ছেলেটাকে ধরে কোন মতে বেঞ্চে এনে বসালেন। জলের বোতলটা সামনে ধরতেই প্রায় এক নিঃশ্বাসে বোতল নিঃশেষ করে ছেলেটা যেন সম্বিত ফিরে পেল। একনাগাড়ে অসংলগ্ন ভাবে “লাইন”, “বডি”, “মেয়ে” এসব বলতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদেই গ্রামের লোকেরা রেল লাইনটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে গিয়ে জড়ো হল। ঠিক এক সপ্তাহ আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গোটা গ্রাম যেন থমকে গেল। টানোক নড়লো পুলিশের। স্পেশাল ট্রেনে পুলিশ স্থানীয় থানার কর্তাদের সাথে এলেন একজন সুদর্শন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। পরনে নীল শার্ট, ঘিয়া রঙের প্যান্ট, পায়ে স্যান্ডেল, চোখে হালকা পাওয়ারের ফুল ফ্রেমের চশমা।

ট্রেন থেকে নেমেই ভদ্রলোক সোজা গিয়ে ঢুকলেন স্টেশন মাস্টারের ঘরে। পুলিশ তখন জেরায় ব্যস্ত। এরপর ভিড়ের পেছন দিয়ে লোকটা সোজা চলে গেল প্রথমে রেল-লাইনে, যেখানে বডি ছিল। গিয়ে লাইনে ঝুঁকে কি যেন দেখল আর হঠাৎ কিছু একটা তুলে নিল। তারপর সোজা হেঁটে চলে গেল ঠিক একটু দূরের সেই হোগলা বনে, যেখানে এক সপ্তাহ আগে প্রথম ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে সময়টা একটু বেশি লাগল। প্রতিটা শুয়ে পড়া হোগলায় গ্লাভস আর আতশ কাঁচ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগলো সে। প্রায় আধঘন্টা পর সে যখন হোগলা বন্ধ থেকে বেরোলো তখন তার ঠোঁটে খেলে গেল একটা হাসি, কিন্তু কপালে ছোট্ট একটা ভাঁজ থেকেই গেল। স্টেশনে ফিরে এসে সে চাওয়ালা রামু আর সেই ছোকরা ছেলেটাকে নিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে বসলো। মিনিট পনেরো পর সোজা প্ল্যাটফর্মের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো। পুলিশকর্তা তার দিকে এগিয়ে এলো।

“মিস্টার মিত্র কি বুঝলেন?” এই জেলার এস.পি মোহন ভার্গব বললেন।

উত্তরে সুদর্শন পুরুষটি সিগারেট নামিয়ে একটা ছোট্ট প্যাকেট এগিয়ে দিলেন পুলিশ কর্তার দিকে। অবাক হয়ে পুলিশ কর্তা ভার্গব দেখলেন প্যাকেটে একটা বোতাম। তিনি অবাক সরে প্রশ্ন করলেন, “ কি এটা মিস্টার মিত্র?”

“আততায়ী ও ধর্ষকের শার্টের বোতাম” । উত্তরে বললেন লালবাজারের বিখ্যাত গোয়েন্দা শ্রী সঞ্জীব মিত্র। সে রাতের ট্রেনে পুলিশ ফিরে গেল আততায়ী ধর্ষক কে নিয়ে। শুধু গ্রামবাসীদের অনুরোধে ফিরলেন না এসপি মোহন ভার্গব এবং লালবাজারের গোয়েন্দা সঞ্জীব মিত্র। রাতে গ্রামের টাটকা দেশি মুরগির ঝোল ভাত খাওয়ার পর গ্রামের বটতলায় হ্যাজাক বাতি জেলে বসলো সকলে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সঞ্জীব মিত্র শুরু করলেন -

“প্রথম ঘটনার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল আমার। কেস রিপোর্ট দেখে মিতার খোঁজখবর নিতে জেনেছিলাম মেয়েটার বাড়ি অন্য গ্রামে। দ্বিতীয় মেয়েটিরও তাই। এরপর সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চে গিয়ে, লাস্ট কল রেকর্ড দেখেই আমি সূত্রটা পাই। তারপর আজ ঘটনাস্থলে এসে বাকিটা পরিষ্কার হয়। মোহন বাবু আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি আপনার সাথে না নেমে, একা নামি ও সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢুকে যাই।” হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন মোহন ভার্গব। ফের শুরু করলেন সঞ্জয় বাবু।

“ঘরে ঢুকেই আমি খুব সাবধানে আলনাটা ঘেঁটে দেখি। তারপর একটা ডাস্টবিন দেখি যেটাই গতরাত্রের খাবারের অবশিষ্ট আর তার সাথে ছিলো কিছু লম্বা চুলের গোছা। তারপর জানালা দিয়ে দেখতেই বাইরের দেওয়ালের একটা দড়িতে কতগুলো জামা দেখতে পাই। ওগুলোর মধ্যে দুটো জামা আমি একটা পলিথিনে মুড়ে ফরেন্সিক ডাক্তারের হাতে তুলে দেই। মনে আছে আপনার হাতে একটা বোতাম দিয়েছিলাম মোহন বাবু?”

মোহন বাবু সহাস্য বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বুঝেছি।” কিন্তু হঠাৎ থমকে গিয়ে ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, “কিন্তু মোটিভ?”

বলছি, সব বলছি। বলে আবার শুরু করলেন সঞ্জীব বাবু।

“স্টেশন মাস্টার লোকটা একটা সাইকোপ্যাথ এবং সেটা আমি জানতে পারি ওর ঘরে কয়েকটা নোংরা বই দেখে। এরপর মেয়ে দুটোর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি তারা দুজনেই নামী কোম্পানির ফুড ডেলিভারি গার্ল। স্টেশন মাস্টার লোকটি যে প্রতিনিয়ত বেশ্যাপাড়ায় যাতায়াত করতো, সেটাও আমি ইতিমধ্যেই খোঁজ পেয়েছি। হঠাৎ তার মনে পয়সা না খরচ করে স্বাদ বদলের ইচ্ছা জাগে। খবরের কাগজে সে ওই কোম্পানিগুলির সম্পর্কে জানতে পারে। ফোন করে সে খাবার অর্ডার দেয় এবং মহিলা খাবার দিতে এলে, তাকে বিভিন্ন বাহানায় ঘরে আসতে বাধ্য করে বা মানিয়ে নেয়। এরপর ওই ঘরে সে তাকে ধর্ষণ করে এবং খুন করে। সবশেষে ভোর রাতে সে যখন তার লাশ হোগলা বনে ফেলে ফিরছিল, তখনই চাওয়ালা রামু তাকে দেখে ফেলে। তাই কিছুদিন সে চুপচাপ থাকে। তবে তার মানসিক বিকৃতি তাকে বেশিদিন চুপ থাকার অনুমতি দেয়নি। ফের একইভাবে অন্য একটা ফুড ডেলিভারি কোম্পানি থেকে খাবারের অর্ডার দেয় সে, এবং একইভাবে ধর্ষণ ও খুন করে। কিন্তু আবার পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলতে পারে, এই ভয়ে সে বডি রেললাইনে ফেলে চলে আসে। দু'বারেই তার জামা দুটোতে মেয়ে দুটোর রক্ত লেগেছিল। লোকচক্ষু এড়িয়ে জামা দুটো ধুয়ে সে রোদে শুকাতে দিলেও ওই বোতামের সাহায্যে জামা দুটো চিনতে আমার কোন কষ্ট হয়নি।”

বলেই থামলেন। একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে আবার বললেন -

“ফরেনসিক রিপোর্ট এলেই রক্তের দাগও বেরিয়ে আসবে আর মেয়ে দুটোর রক্তের ডিএনএ-এর সাথে ওই চুলের গোছার ডিএনএ রিপোর্ট মিলেও যাবে আর বাকিটা স্পষ্টও করে দেবে ।”

ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। ঠান্ডা বাতাস গায়ে মেখে নফরগঞ্জের সরল সাদাসিধে মানুষগুলো হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সঞ্জীব বাবু ও মোহন বাবুও উঠে দাঁড়ালেন। লাল সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভেজা দুর্বা ভরা মাটির আর ঝরে পড়া শিউলির গন্ধ মাখা এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে সঞ্জীব মিত্র বললেন -

“মা আসছেন, মা কি সত্যিই আসছেন?”

ছায়া

- সুরেশ ব্যানার্জী



যাই হোক আজ একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম। কম দামের মধ্যেই পেয়ে গেলাম, ভাবতে পারিনি এত কম দামে পেয়ে যাব। গত সপ্তাহ থেকে স্কুল শুরু। এরই মধ্যে সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসতে হবে। আমি গোবিন্দপুরে চাকরিটা পেয়েছি, গোবিন্দপুর আপার প্রাইমারি স্কুল। বাড়িটা তেমন বড় নয় কিন্তু দেখে মনে হলো বাড়ির আসল মালিকের প্রতিপত্তি ছিল মোটামুটি। যাদের কাছ থেকে কিনেছি, তারা কলকাতায় থাকে। তাদেরও এইটা কেনা বাড়ি। কিন্তু কেউ আসার সময় পায় না বলে বাড়িটা বিক্রি করার জন্য একজন কাউকে খুঁজছিল। অবশেষে আমি পেয়ে গেলাম বাড়িটা। বাড়ির ভেতরটা পরিষ্কার করে আসবাবপত্রগুলি রেখে বাজারের দিকে বেরোলাম।

"কি মাস্টারমশাই কেমন লাগছে, এখানে এসে?" বলল সুধীর বাবু। সুধীর বাবু হলেন আমাদের স্কুলের ক্লার্ক।

বাজারে ঠিক এই দোকানে চা খেতে বসেন উনি। তিনি অবশ্যই দোকানটি আমায় চিনিয়ে দিয়েছেন। খুব সুন্দর চা করে এলাচ দিয়ে। এরই মধ্যে আমার পাশে এসে বসলেন বিনয় বাবু, আমাদের স্কুলের টিচার। জিজ্ঞেস করলেন, "কই হে শংকর কোথায় উঠলে"।

"ওই তো বটতলা পেরিয়ে যেই বাড়ীটা আছে না? ওই বাড়িতে", আমি বললাম। সুধীর তুমি ওকে কিছু বলনি? আমি বললাম, "কেন কিছু অসুবিধা আছে ওই বাড়িতে থাকলে?"।

সত্যি কথা বলতে তেমন কিছু নেই কিন্তু লোকমুখে অনেক গালগল্প শোনা যায় ওই বাড়ি নিয়ে। চা দোকানী গৌতম দা বলল, "ওইখানে নাকি কিছু একটা ঘটেছিল, খুন খারাপই হবে হয়তো। যার কারণে ওই ঘরটা অনেক বছরের পরিতক্ত পড়ে আছে। সেরকমভাবে কেউ আসে না। ঘটনাটা অবশ্য ২০- ৩০ বছর হয়ে গেল। কিন্তু প্রতি অমাবস্যার রাতে এক অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়।"

"এই তো অমাবস্যা এসেই পড়লো। কালকেই তো অমাবস্যা। দেখি কোন রূপবতী ভুতনির দেখা পাই কি না...", বলে হো হো করে হেসে উঠলাম।

আমি সাধারণত ভূতে বিশ্বাস করিনা। তাই বলে যে ভূতের গল্প পড়ি না তা নয় শুনতেও ভালো লাগে বা পড়তেও ভালো লাগে, কিন্তু মানতে! মানতে আমি পারবো না।

রাত ৮:০০ টায় বাড়ি ফিরলাম। কয়েকটা খাতা পত্র দেখার ছিলো। দেখে বারোটা নাগাদ শুতে গেলাম। ভাবতে পারিনি আজকেই এমন কিছু ঘটবে। আজ অমাবস্যা। আন্দাজ দেড়'টা কি আড়াই'টে বাজবে। গভীর রাত। খাটে এপাশ - ওপাশ করছিলাম। হঠাৎ যেন মেঝে থেকে উঠে এল আওয়াজটা। ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু চোখ খুললাম না। বুঝতে পারছি আমার খাটের চারিদিকে একটা মিষ্টি পারফিউম এর গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন জানিনা আমার হাত পা শিথিল হয়ে গেল। চোখ খুলতে পারলাম না। কতক্ষণ জানি না এভাবেই ছিলাম। হঠাৎ মাথার কাছে কপালে একটা ঠান্ডা বাতাস অনুভব করলাম। চোখ খুলতে মন চাইল কিন্তু খুললাম না। হঠাৎ গোটা শরীর আমার ঠান্ডা হয়ে গেল। ঠিক এই সময় একটা গুলির আওয়াজ একটা মেয়ের আর্তনাদের শব্দে আমার চোখটা খুলে গেল। খুলতেই দেখি নক্ষত্রদের থেকে আসা মৃদু আলোতে চকচক করছে একটা ধাতব বস্তু, সম্ভবত রিভলভার আর সেই রিভলভার ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরুষ ছায়ামূর্তি। আর আমার খাটের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে এক মহিলার ছায়ামূর্তি। সারা বাড়ি ভরে উঠল এক অপার্থিব কান্নার ধ্বনিতে। এরপর কি ঘটেছে আমি জানিনা। পরের দিন সুধীর বাবুদের এ ব্যাপারটা জানালাম। লোকাল থানায় খবর দিয়ে, গোটা বাড়ি পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনুরোধ করি। অবশেষে, যেই রুমে আমি শুই, সেই রুমের মেঝের খোঁড়া হল। আর খোঁড়া হতেই বেরিয়ে এলো এক নর-কঙ্কাল।

সামাজিক প্রতিহিংসায় এবারের পুজো

- স্বরজিৎ সেনাপতি

দীর্ঘ এক বছর পর আসতে চলেছে আরেক শারদীয়ার মহাপ্রক্কাল। প্রতি বছরের ন্যায় আমরা আবার মিলিত হবো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে। মুখরিত হবে ঢাক ঢোল আর উৎসবের কলরবে বাঙালি সংস্কৃতির এই শ্রেষ্ঠ প্রাঙ্গণে, আমরা আবার অংশ নেব দেবী শক্তির জয় আর অসুর শক্তির পরাজয়ের কাহিনীর স্মরণে।

ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা আমাদের সমাজ ও মনস্কতা কে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত এবং আলোড়িত। ঘটে যাওয়া এসব অপ্রত্যাশিত এবংঅকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো আমাদের মনুষ্য সমাজকে দাঁড় করিয়েছে অনেক প্রশ্নের মুখে। কেরালার ওয়ানাড এর প্রবল ভূমিধস, বাংলাদেশের আকস্মিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, এবং আরজিকর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া বর্বর দুর্ঘটনা ফুটিয়ে তুলেছে সমাজের নগ্নচিত্র টিকে। যেখানে আছে শুধু হিংস্রতা আর অমানবিকতার গর্জন।

ক্রমাগত বেড়ে চলা সাম্প্রদায়িক হানাহানি কুশাসন আর দুর্নীতির পাহাড় সম বিস্তার অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিস্তার বারবার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে মনুষ্য সমাজের পাশবিক ও স্বার্থান্বেষী চরিত্রের। যা হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক সার্বিক ঐক্যের অন্তরায়। এটি নিছক সমাপতন নাকি আরো গভীর অর্থ বহন করে আমাদের জন্য, তা ইতিহাসের কাছে বিচার্য।

স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রশ্ন জেগেছে সাংস্কৃতিকমনস্ক ব্যক্তিদের মনে। সমাজের এই দুর্দশা আর বিষণ্নতার কাহিনী পড়েছে আমাদের বিবেককে আলোড়িত। এই অতি আধুনিক বিজ্ঞানময় সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া এইসব বিভাজনমূলক ঘটনাক্রম ভেঙে দিয়েছে সম্প্রীতি ও শান্তির রূপরেখাকে। সমাজের এরকম নৈতিক আর সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিস্থাপিত করছে এক দিকহীন ভ্রান্ত ও অসহিষ্ণু সমাজের মননকে। এর পিছনে কোন কোন কারণগুলি লুকিয়ে আছে তার উত্তর আমাদের খুঁজতেই হবে।

কোন সমাজের সংস্কৃতি হলো সেই সমাজের ঐতিহ্য আর উৎকর্ষতার বাহক। তার অবক্ষয় নির্দেশিত করে গোটা সমাজ তথা দেশের বিপন্নতার ছবি। যে সমাজে মেয়েদের দেখা হয় সভ্যতার বাহক ও সৃষ্টিকারী হিসেবে, সেখানে তাদের প্রতি প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া বর্বরোচিত ও পাশবিক ঘটনাগুলো অঙ্গুলি নির্দেশ করে ওই সমাজের ভঙ্গুরতা ও বিলুপ্তির পর্যায়ক্রমিক কাহিনী কে। দেবী রূপে যেখানে মহিলা পতিত হন সেখানে ঘটে যাওয়া লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যগত নিষ্ঠুর ঘটনা ওই সমাজের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা কে প্রশ্নের মুখে তুলে ধরেছে। নীতি থেকে ভ্রষ্ট আর সাংস্কৃতিক প্রতি থেকে দূরে সরে যাওয়া বাঙালি সমাজ আজ আরেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যার থেকে আমরা মুক্তি পাব নাকি মান আর হুঁশ হারিয়ে মেষ রূপে থেকে যাওয়াটাই হবে আমাদের ভবিতব্য, তাই দেখার বিষয়।

মা দুর্গার আগমনের প্রাক্কালে চলুন আমরা স্মরণ করি বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দকে এবং অনুসরণ করি মনুষত্বের মতাদর্শ গুলিকে। করি হৃদয় আর মনকে পাপ মুক্ত। অ দৃষ্টিভঙ্গিকে সুস্থ ও প্রেমময়

তবে রক্ষা করতে পারব জাতির জর্জরিত ও মৃত প্রায় দেহ ও মনটাকে। চলুন এই মহান ব্রথে আমরা সবাই সামিল হই।



আতশকাঁচে শৈশব

- সঙ্গীতা গাঙ্গুলী



বয়স বাড়লে অনুভূতিগুলো কেমন পাল্টে যায়। ছোটবেলায় মহালয়ার আগের রাতে পাড়ায় পিকনিক হতো। বড় চোঙ লাগানো হোত। ভোরবেলা তিনবার শঙ্খধ্বনি দিয়ে শুরু হয়ে যেত মহালয়া। আমাদের বাড়িতে ভাল্ভওয়ালা রেডিওতে মহালয়া শুনতাম সবাই। ঐ ভোরবেলা এক রাউন্ড চা খাওয়া হয়ে যেত বড়দের। সেদিন ভোরের আগে থেকে সজাগ থাকতে হোত, নাহলে বাগানের গাছের ফুল একটাও থাকতনা। মিটারঘরের কোনায় স্থলপদ্ম গাছে গোলাপী রঙের ফুল ফুটে থাকত, পাশেই তারার মত শিউলি ফুলে ভরে থাকত গাছটা, তখনো ঝরত না মাটিতে। ঊষার আলো ফুটলে গাছের তলায় টুপটাপ খসে পড়ত ফুলগুলো। কতদিন হয়ে গেল, মাটিতে অমন শিউলি পড়ে থাকার অলৌকিক দৃশ্য দেখিনি।

আমার ছোটপিসির তখনো বিয়ে হয়নি। আমি খুব ছোট, তবু মনে আছে আমরা দুজন ভোরে লালকামাঠে হাঁটতে যেতাম, ফুল কুঁড়োনোর একটা আগ্রহ ও থাকত। আশ্চর্য ব্যাপার এটাই যে ,বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠের যে প্রান্তেই যাই না কেন, মহালয়া আমাদের সাথে সাথেই যেত। কোন গান মিস হোতনা। এক বাড়ির রেডিওর রেশ শেষ হবার আগেই অন্য বাড়ির রেডিও তার খেই ধরে নিত রিলেরেসের মত। দুবছর আগেও ঐ এক সময়ে এক ই জায়গাতে হাঁটছিলাম, চারিদিক নিস্তব্ধ,আর পাঁচটাদিনের মত। এখন রেডিওতে মহালয়া শোনা বোধহয় স্টেটাস সিম্বলের পরিপন্থী।

আমাদের ছোটবেলায় মহালয়ার সময়ে বেশ ঠান্ডা পড়ে যেত, আজন্ম টনসিলের সমস্যায় ভোগা আমাকে, পারলে পুজোর সময়েও মাফলার পরিয়ে ঘোরাতে পারলে খুশি হোত বাড়ির লোকজন। তাই মায়ের সাবধানবানী মেনে কানে গলায় মাফলার জড়িয়ে বারান্দায় বসতাম খানিকক্ষণ, তারপর আবার নিদ্রাদেবীর স্মরণ নিতাম। এতবছর পর সততাবজায় রেখে বলতে গেলে বলতে হয়, ছোটবেলায় কখনো গোটা মহালয়া শুনেছি বলে মনে পড়ে না। “বাজল তোমার আলোর বেণু” তে সম্পূর্ণ জাগ্রত আমাকে দ্বিজেনবাবু “জাগো তুমি জাগো”বলে ক্ষণিক জাগালেও শেষটায় ঘুমিয়ে জেগে “রূপং দেহী” তে জেগে উঠতাম। শেষের দিকে বীরেন্দ্র ভদ্রের গলাটা কেমন কান্নায় অবরুদ্ধ শোনাত। তখন তার কারণ বুঝতাম না।

এরপর খানিকটা বড় হলাম, গানগুলো ভালো লাগতে শুরু করল। ভোরবেলা বারান্দায় বসার সময়টা বৃদ্ধি পেল, কারণ ততদিনে শরতের অতিথি মনের দুয়ারে ইতিউতি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

একটু প্রেম প্রেমভাব, মানে বাছুরে প্রেম আর কি, মনে হানা দিচ্ছে। যদিও ঋতুপরিক্রমার আগেই তার ভরাডুবি ঘটল। এরপর থেকে মহালয়া আসলেই পুজোর ঘন্টা বেজে যেত। আমাদের ক্লাবে দুর্গাপূজার আয়োজনে মেতে উঠতাম সবাই। আড়ম্বড়হীন, কিন্তু বড় আন্তরিক ছিল সে পুজো। প্যান্ডেলের চাকচিক্য নেই, কিন্ত বন্ধুদের হাসিমজায় ঢাকা পড়ে যেত সেসব। ভোরবেলা স্নান করে শাড়ি পড়ে পুজোর কাজ করার আনন্দই আলাদা। উপোস করে অঞ্জলি, তারপর চালমাখা খাওয়া, পুজো দেওয়ার বাটা থেকে সন্দেশ সরিয়ে রাখা, দুপুর বেলা ক্লাবঘরে ছেলেবন্ধুদের আনা মোর সিগারেটে প্রথম টান দিয়ে হেঁচেকেশে একশা হওয়া - কম পাপ করিনি সেসময়। মনে আছে একবার চাঁদা তুলে কোল্ডড্রিংকস খাওয়া হবে, টাকা কম, কিন্তু ভাগীদার বেশী, আমি আর এক বান্ধবীর ভাই(নাম বলছিনা, ওর এখন দুই ছেলে, সম্মানহানির ভয় আছে) দুজনে দোকানে গিয়ে এক্সট্রা দুটো বোতল, সোজাকথায় যাকে বলে ঝেঁপে এনেছিলাম। পরে বহুবার ভেবেছি টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবায়িত করতে পারিনি, আর এখন তা সুদে আসলে যা দাঁড়িয়েছে - তার চেয়ে এই ভালো, কিছু পাপ সঙ্গে থাক।

ইউনিভার্সিটিতে তখন ফার্স্ট ইয়ার, সে বছর আমার জন্মদিনের দুদিন আগে বাবা মারা গেলেন। প্রথম শোকের অভিঘাত, ক্রমশ সামলে দিলেন আমার কাকু। বাবার থেকে কোন অংশে বেশি ছাড়া কম নন তিনি। এরপর থেকেই পুজো এলে আর আগের মত আনন্দ হোত না, একটা চাপা বিষন্নতায় ছেয়ে যেত মন।

বিয়ের পর এবাড়িতে এসে দেখি, এখানেও মহালয়া দেখা নয়, শোনার চল। ভোরবেলা ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ছোট রেডিওটা চালিয়ে দিতাম। সারাবছর অবহেলায় পড়ে থাকা রেডিওটার পুজোতে নতুন দুটো ব্যাটারি জুটত। কিন্ত সর্বহারার কপালে তো সুখ লেখা থাকে না, তাই দুদিন পরেই ঐ দুটো , টর্চের ভিতরে গিয়ে সেঁধোত। পতিদেব শুরুতে জেগে থাকলেও পরের দিকে শুধু নাসিকাই তার সরব জাগরণ জানান দিত। বিয়ের পর থেকে কেন জানিনা মহালয়া শুরু হলেই বুকের ভিতরটা কেমন করত, গলায় দলাপাকানো কান্না, সে কি কৈশোর হারিয়ে ফেলার শোকে?

এরপর একবার দীপাবলির দুদিন আগে মা চলে গেলেন, পৃথিবীটা যেন আঁধার করে এল। নিঃসন্তান জীবনে মা ছিলেন আমার আশ্রয়। এবারো মাথায় ছাতা ধরলেন কাকু। পুজোর আলো আরো ম্লান হয়ে এল। বছর পাঁচেক আগে ইংরাজী বছরের প্রথম দিনে আমার জীবনের ফ্রেন্ড ফিলজফার গাইড, আমার সবকিছু, আমার কাকু, ভোরবেলা ঘুমের মাঝেই পাড়ি দিলেন অজানার পথে। এতদিনে প্রকৃত অনাথ হলাম আমি। বড়রা সব বিদায় নিয়েছে একে একে,জীবনের চড়ারোদে ঝলসে যাই আমি,হোঁচট খেলেও তাদের মত কেউ পাশে নেই।এখনো মহালয়া আসে, ভোরবেলা ঐ মাহেন্দ্রক্ষণে "হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে",
কেন যে চোখের জলের জোয়ার লাগে জানিনা।

তবু মহালয়ার সঙ্গে প্রানের যোগ অবিচ্ছেদ্য, কারণ, সে আমার মনের সুখের তারে নয়,দুঃখের তারে বাঁধা, দুঃখ ই তো প্রকৃত জীবনশিক্ষক। আজ যখন সবকিছু অতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, প্রিয় মানুষগুলো একে একে হাত ছেড়ে যাচ্ছে, এই অনিশ্চিত পৃথিবীতে কোনকিছুই যখন ধ্রুব নয়, তখন ঐ একটা ভোর, ঐ কিছুটা সময় যেন মুঠোভরে এনে দেয় হারিয়ে ফেলা দিন। যতদিন চেতনা সজীব থাকবে,ততদিন বছরে মাত্র একটা দিন ,অলৌকিক এক ঊষামুহূর্ত থাকবে অপরিবর্তিত।কিছু বেদনা একটা টনটনে চেতনাবিবশকারী আচ্ছন্নতা দেয়।
মহালয়া আমার কাছে এমনই বিষাদবিধুর অনুভব। হয়ত তা আমার বেদনাবিলাস।

মনে পড়ে পুজোর বেশ কিছুদিন আগের ছবি। বাবা পিতৃপক্ষের শুরু থেকে প্রতিদিন তর্পণ করতেন। ঠাকুমার কাজ ছিল কোষাকুশি, আসন সব গুছিয়ে দেওয়া। বাবা একাধিক বার অভিমুখ পরিবর্তন করে তর্পণ সমাধা করতেন, মা তৈরি থাকতেন অফিসের ভাত নিয়ে। কোনমতে নাকেমুখে গুজে অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা। দীর্ঘদিন এর কোন ব্যত্যয় ঘটে নি।শেষের কবছর শরীর অসুস্থ থাকায় শুধু মহালয়ার সকালে তর্পণ করতেন।

আমার বাবা প্রতিবার পুজোর জামাকাপড়ের ফর্দ বানাতেন, মাও অংশ নিতেন। প্রথমেই ঠাকুমার একজোড়া সাদা থান দিয়ে লিস্ট শুরু হোত। কাকা পিসি সবাইকে নিয়ে অনেক বড় সংসার। দাদার একটা জামা প্যান্ট হলেও আমার নামের পাশে কিন্তু দুটো লেখা থাকত। যারা বলেন সংসারে মেয়ের চেয়ে ছেলের কদর বেশি, তাদের নিয়ম আমাদের বাড়িতে চলত না। বাড়ির বড় এবং ছোট সদস্য হিসাবে ঠাকুমা আর আমি উভয়েই একটু প্রিভিলেজ তো পেতামই।জামার সাথে আসত নতুন জুতো, ছোট থেকেই পায়ের ব্যথার কারণে জুতো নিয়ে কখনোই জুতসই স্টাইল করা হলনা, এ খেদ আমার যাবার নয়। হয় পাম্প সু, নয়তো বেল্ট দেওয়া জুতো, জীবনে হিলতোলা জুতো না পড়লেও অধুনা হীলের ব্যথা যেন হলাহলসম মনেহয়। শত ওষুধেও তা আর হিল হয়না।যাহোক, সেই নতুন জুতো প্রথম ক'দিন একেবারে রাজকীয় মর্যাদা পেত, নতুন অবস্থায় ওটা পরে খাটের উপর হাঁটতাম, প্রথম প্রথম পরার পর যত্ন করে বাক্সে তুলে রাখতাম। পুজোতে নতুন জামার সাথে নতুন জুতো পরে যতটা গটগটিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরোতাম, ফেরার সময় ততোধিক বিধ্বস্ত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরতাম। উপরি পাওনা হোত দুপাশের গোড়ালির উপর দুখানা ফোস্কা। ফলত পরের দিনগুলো কৌলিন্যহীন পুরানো জুতো পরেই প্রতিমা দর্শণে যেতাম। পরে অবশ্য আক্কেল হয়, একটু বড় হওয়ার পর, আগে থাকতে নতুন জুতো পরে ওটাকে পোষ মানিয়ে রাখতাম।

খুব ছোটবেলার কথা, আবছা মনে পড়ে ঠাকুমা একবার কুমারী পুজো করেছিলেন। বলা বাহুল্য আমিই ছিলাম মূর্তিমতী কুমারী। মায়ের বিয়ের গোলাপির উপর রুপোলি জরির কাজকরা বেনারসি,মাথায় ওড়না, মায়ের বিয়ের জরোয়ার সেট, শুধু মায়ের আংটিটা উল জড়াতে জড়াতে একটা ঢিপলামত বানিয়ে পরানো হয়েছিল, ওটাতে একটু সজ্জাহানি ঘটছিল আর কি। সামনে অনেক ফলমিস্টি ভোগ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। সব মিলে সে একটা মেফিস্টোফিলিস ব্যাপার ।এখন দুঃখ হয়, যে সেসময় সেলফি তো দুরস্ত, বাড়িতে একটা ক্যামেরাও ছিল না, থাকলে সেই রাজকীয় ব্যাপারের একটা স্মৃতি থাকত।

ছোটবেলায় পুজোর দিন স্নান করে সাদা টেপজামা পড়তাম, বুকের কাছে রান সেলাই করে হাঁস-পাখি-ফুল নকশা করা থাকত। এখনো চোখের সামনে ভাসে। এখনকার মেয়েরা ওসব দেখে নির্ঘাত নাক সিঁটকোবে। বেশিরভাগ সময় জামার কাপড় কিনে জামা বানিয়ে দেওয়া হোত। বাড়ির বাধাধরা এক দরজি ছিলেন, না না, নেফামত খলিফা নয়। মজুমদার জেঠু, বাবা কাকুদের জামা-প্যান্ট বানাতেন, তিনিই তার পছন্দের ডিজাইনে জামা বানিয়ে দিতেন। নিজস্ব পছন্দ তৈরি হবার আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বাড়ির ফ্যাশন ডিজাইনার।

ছোটবেলায় বড়দের দেখেই ছোটরা তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করত। তো আমার এহেন একটা অনুপ্রেরণাজাত অনুকরণস্পৃহা যে কতটা অনুশোচনার কারণ হয়েছিল, ভাবলে আজো নিজের প্রতি অনুকম্পা হয়।

আমার ছোটপিসিকে দেখতাম ছোট মানিব্যাগ বা রুমাল ব্লাউজের ভেতরে বা কাঁধের নীচে ঢুকিয়ে রাখত। প্রয়োজনে বের করে টাকা পয়সা দিয়ে আবার সেখানেই রাখত। সেসময় অনেকেই এটা করতেন। একবার পুজোতে আমার বড়কাকা আমায় দশ টাকা দিয়েছেন, সেবার বায়না করে একটা

ছোট্টকয়েন পার্সও কিনেছিলাম, তাতে সাদার উপর নীল ফুলফুল একটা ছোট্ট রুমাল আর ঐ ব্যাঙের আধুলি দশটাকা ভরে ওটা সেফ জায়গায় নিয়ে পুজো পরিক্রমাও সেরে এলাম। বাড়িতে ফিরেই আক্কেল গুড়ুম।পার্সটাতো নেই। সবাই জিজ্ঞেস করছে “কোথায় ফেলেছিস, হাতেই তো নিবি, যাবে কোথায়”? আমি খুব ক্যাজুয়ালি বলেছিলাম “কেন,এই তো এখানে রেখেছিলাম”।বলে স্মার্টলি ঢিলেঢালা মিডিফ্রকটার বা কাঁধের নিচে নির্দেশ করলাম। সবার মুখচাওয়াচায়ি আর তারপর সমস্বরে হাসি। পিসি, মানে যাকে ফলো করতে গিয়ে আমার বা আমার মানিব্যাগের এই অধঃপতন, সেও হাসছে দেখে বুঝলাম কিছু একটা গন্ডগোল করেছি। এরপর এতগুলো বছরে কত টাকা উপার্জন করেছি, কিন্তু হারিয়ে ফেলা ঐ দশটাকার শোক আজো ভুলতে পারিনি।

পুজোর কদিন দেখতাম সবকিছু সেরে দুপুরবেলা মা খাবার বানাতেন। নিমকি, এলোঝেলো, লবঙ্গলতিকা, নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া এসব। বিজয়াতে লোকজন এলে তাদের দেওয়া হবে। কী অপরিসীম ধৈর্য আর নিষ্ঠা, আমরা তো এখন কেউ এলে দোকান থেকে বা ফোন করে খাবার আনাই। এখন আবার ফোন না করে অতিথি আসলে আমরা বিরক্ত হই,কিন্ত মায়েদের সময় যখন তখন বিনা নোটিশে অতিথি আসতেন। খাওয়া দাওয়া করতেন, কখনো এর জন্য মাকে অনুযোগ করতে শুনি নি। বাবার দুপুরবেলা কাজ ছিল, বসে বসে পোস্টকার্ডে বিজয়ার শুভেচ্ছা লেখা। বাড়ির কাছেই ছিল সুলেখা কালির কারখানা।চাইনিজ ইঙ্ক পেনে দোয়াতের কালি দিয়ে লেখা হোত চিঠি, এখন যার নবকলেবর সংক্ষিপ্ত এস এম এস । দশমীর পরদিন সেগুলো ডাকবাক্সে ফেলা হোত। এখনকার দিনে কেউ এমন পোস্টকার্ড পান কিনা জানা নেই।

বাবার খুব গানের সখ ছিল, অভাবের কারণে যৌথ পরিবারের জাঁতাকলে শেখা হয়নি। আমাকে দিয়ে সে শখের পরিপূরণ করতে চেয়েছিলেন তবে তা পরিপূর্ণতা পায়নি। গানটা গাইতে পারি, এইমাত্র। সুখশ্রাব্য না অশ্রাব্য তা শ্রোতা বলতে পারেন। পুজোর ছুটিতে বাবা হারমোনিয়াম নিয়ে সঙ্গীতচর্চায় বসতেন। অফিসের একজনের কাছে গান শিখতে যেতেন মাঝেমাঝে। বাবার গানের খাতায় গানের সংখ্যা খুব কম, সেগুলোই রোজ গাইতেন। নিঝুম সন্ধ্যায়, মধুর আমার মায়ের হাসি, মনে কি দ্বিধা, এসব গান করতেন। যে ভদ্রলোক গান শিখিয়েছিলে, তিনি বোধহয় দুটিই রাগ জানতেন ভূপালী আর আলাহিয়া বিলাবল,তাই উজার করে দিয়ে তিনিও হয়ত রাগশুন্য হয়েছিলেন। বাবাও সারাজীবন ঐ দুটিই অনুশীলন করে গেলেন। সকালবেলা বাজার আর জলখাবারের পাট সেরেই বসে পড়তেন গানের খাতা নিয়ে।

সন্ধ্যায় অফিসের লাইব্রেরী থেকে আনা বই পড়তেন। মাঝে মাঝে মাকে শোনাতেন, মা রান্না করছেন, আর বাবা রান্নাঘরের চেয়ারে বসে বই পড়ছেন, দৃশ্যটা চোখ বুজলে দেখতে পাই। আজ যখন স্বামী স্ত্রী সবাই এক ভার্চুয়াল জগতে মগ্ন, তখন এমন দৃশ্য কপোলকল্পনা বলেই মনে হয়। মাও খুব ভালবাসতেন বই পড়তে। সেলাই করতেও। বাবাদের কোম্পানির সাথে হয়ত মাদুরা কোটস কোম্পানির কোন আসা যাওয়া ছিল। ওখানকার ক্যালেন্ডার আসত ফি বছর।মোটা তেলতেলে পাতা। বাবা ঐ কোম্পানির সুতো এনে দিতেন মাকে। এতবড় সংসারের ঊনকোটি কাজ সামলে মা নানান শখের জিনিস সেলাই করত। বাবা চলে যাওয়ার পর মা চোদ্দ বছর ছিলেন। তখন একটা ডায়েরীতে অনেক কিছু লিখতেন, কবিতাও। শেষদিকে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেলে রেডিও শুনতেন। আর কখনো কিছু লিখতে চাইলে মুখে বলতেন, আর আমার ছোটকাকা সেগুলো লিখে রাখত, পরে আমার পিসির মেয়ে, আমার ছোট বোন সেগুলো ওর সুন্দর হস্তাক্ষরে মার ডায়েরীতে কপি করে দিত। মা নেই, কিন্তু ডায়েরীটা আছে।

পুজো এলে খুব মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলো। সবাই চলে যায়, হারিয়ে যায় দিনযাপনের রীতিনীতি, কিন্তু স্মৃতির সরনীর বাঁকে মাইলস্টোন হয়ে অক্ষয় থাকে কিছু ঘটনা।

পুজো নিয়ে এখন আর কোন উন্মাদনা নেই।পরিবারের সবাই একত্রিত হওয়া,ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়া, এতেই সব সীমাবদ্ধ। তবু এত বয়স হলেও দশমীর দিনের বিষন্নতা আজও মনকে আচ্ছন্ন করে। মনে পরে ছোটবেলায় অমূল্য পরামানিক আসত,দশমীর কাকডাকা ভোরে,পুরানো রং চটা একটা আয়না নিয়ে। ঠাকুমা বলতেন ওটাকে দর্পণ বলতে হয়।মা ডেকে তুলতেন বাড়ির সবাইকে। মশারি তুলে টেনে আনতেন। ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে ঐ দর্পণে নিজের মুখ দেখতে হোত। কোনমতে আবছা কিছু দেখে আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিতাম। পরদিন ওটা স্বপ্নেদেখা ফিকে ছবির মত মনে হোত। কবে যে অমূল্যকাকুর আসা বন্ধ হয়ে গেল, মনে পড়ে না। মামাবাড়ির পাড়ার প্রতিমা বিসর্জন হোত লালকার পুকুরে। মামার হাত ধরে দেখতে যেতাম, ফেরার সময় মামা সবাইকে একটা করে আখ কিনে দিত। ওটা হাতে নিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরতাম। তখন কত সামান্যতে কত আনন্দ পেতাম। আজ কোন কিছুতেই আনন্দ নেই, সব কিছু মেকী, তাই মেকী আনন্দের অনুভূতি তেমন দোলা দেয় না। তাই বারবার চুরি করে আচার খাওয়ার মত ছোটবেলার ছোট ছোট আনন্দকে মনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখি, অনেকটা বড় দেখায়।

বৌদ্ধ বিহারের ভিত্তিভূমিতে রহস্যাবৃত সতীপীঠ

- সায়ন পাহাড়ী

খ্রীষ্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মহাভারতীয় যুগের এক অতি প্রাচীন রাজ্য তাম্রলিপ্ত। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের রাজা ময়ূরধ্বজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই রাজ্য। ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজের নামে রাজ্যের নাম তাম্রলিপ্ত রাখা হয়। ক্রমে এই রাজ্য দামোদরের নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম রূপনারায়ন ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের পশ্চিম দিক থেকে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম অংশে সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর অংশ নিয়ে বিস্তৃত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক যখন ভারতে ভ্রমণে আসেন তখন বঙ্গদেশ পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল যথা - ১)পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ ২)পূর্ববঙ্গ ৩)কর্ণসুবর্ণ ৪)কামরূপ ও ৫)তাম্রলিপ্ত।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের নির্মাণের ফলে তাম্রলিপ্ত রাজ্যের সঙ্গে সমগ্র ভারতের শুধু নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে যোগাযোগ বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ সাধনায় ৩৫ বৎসর বয়সে বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর অখন্ড ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বের হন,ফলে তাম্রলিপ্ত রাজ্যেও বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রভাব পড়ে। তাম্রলিপ্তের রাজা ও রাজ পরিবার পরম বৈষ্ণব ভক্ত হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা দেখিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেননি। তাম্রলিপ্তের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে রূপনারায়ণ ভাগীরথী ও বঙ্গোপসাগরের মেলাভূমিতে গড়ে ওঠে চব্বিশটি সংঘারাম।
খ্রিস্টপূর্ব ২৬৫ অব্দে সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের উন্মাদনায় তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৩ অব্দে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে যাত্রাপথে তাম্রলিপ্তে অবস্থান করেন ও এই বন্দর থেকেই সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য যাত্রা করেন।
তাম্রলিপ্তের রাজধানীতে গৌতম বুদ্ধের সময়কালে যে সংঘারাম গড়ে উঠেছিল সেই সংঘারামে বর্গভীমা মন্দির গড়ে ওঠে বলে ইতিহাস গবেষকদের অনুমান।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে ভ্রমণকালে তাম্রলিপ্তে দু বছর অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি এই সংঘারাম গুলি থেকে বৌদ্ধ দর্শন, উপাচার, আচার-আচরণ, শিক্ষা গ্রহণ ও বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্তি অঙ্কন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানে তমলুক শহর জনপদে সংঘারামে প্রতিষ্ঠিত দেবী উগ্রতারা রূপী বর্গভীমা দেবী বলে অনুমান করা হয়। অনেকের মতে পাথরের উপর খোদিত মূর্তিটি বৌদ্ধদের পূজিত দেবী উগ্রতারা বা বজ্রতারার মূর্তির অনুরূপ। মূর্তিটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় দুই ফুট,দুই ইঞ্চি পুরু ল্যাটেরাইট শিলার উপর খোদিত, একহাতে খড়্গ ও একহাতে ধৃত মুন্ডু রয়েছে।

ত্রৈলক্যনাথ রক্ষিত 'তমোলুক ইতিহাস' এ লিখেছেন, - 'উল্লিখিত এই দেবীর ধ্যান ও পূজাদি যোগিনীতন্ত্র এবং নীলতন্ত্রানুসারে হইয়া থাকে। রাজ প্রদত্ত ভূমির উপসত্ব হইতে দেবীর সেবাদি নির্বাহ হইয়া আসিতেছে।' বর্তমানে যে মূর্তিটি প্রদর্শিত হয় তা ঐ শীলার উপর রক্ষিত ও সজ্জিত রূপার ও অন্যান্য অলঙ্কারে ভূষিত। এই সংঘারাম বর্গভীমা মন্দিরের গঠনশৈলী সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত তাঁর 'তমোলুক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, উড়িষ্যাঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ এবং অবিকল বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রধান

বা বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। হতদৃষ্টে অনুমান করা যায়, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল, যাহাতে ভিক্ষুকগণ একা একা নির্জনে উপাসনা করিতেন, এবং সম্ভবত প্রধান বিহারে শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের মুখপদ্ম বিনিসৃত (সর্ব-ধর্ম-সার) উপদেশ প্রদান করিতেন। পরে হিন্দুগণ কর্তৃক বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া পূর্বদিকের প্রধান দ্বারসহ পার্শ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র বিহার ভগ্ন করিয়া মধ্যের মূল বিহার ও পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বিহারের উপর পশ্চিমদ্বারী করিয়া এক মন্দিররূপে নির্মাণ করিয়াছেন।

দেবী বর্গভীমাকে অনেকে চণ্ডীতন্ত্রে কথিত ভীমাদেবী বলে মনে করেন। ৫১ পীঠের মধ্যে তমলুকের বর্গভীমাও একটি পীঠস্থান - দেবী কপালিনী(ভীমরূপা) ও ভৈরব সর্বানন্দ। কেউ বলেন, বজ্রয়ান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত 'বজ্রভীমা' নামে কোন দেবী শব্দ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্গভীমা হয়েছেন। আবার কারুর মতে, যে মূর্তি প্রতীকে দেবী পূজিতা হয় চলেছেন সেই পাথরে চতুর্ভূজা দেবীমূর্তি ছাড়া একটি পুরুষমূর্তির (শিব) অবস্থিতির জন্যই 'ভীমা' শব্দের সঙ্গে 'বর্গ' যুক্ত করা হয়েছে। 'বর্গ' শব্দটি ব্যবহারের অর্থই হল একাধিক দেব-দেবীর মিলিত প্রকাশ।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল (অভয়ামঙ্গল) কাব্যে এই দেবী সম্পর্কে লিখেছেন-
'গোকুলে গোমতীনামা তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া'।

অষ্টম শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত বন্দর ঐতিহ্যের অবলুপ্তি, ব্রাহ্মণ্যবাদের চরম দাপট, শৈব্য ও শাক্তধর্মের প্রভাবের ফলে তাম্রলিপ্ত রাজ্য থেকে বৌদ্ধরা প্রায় বিতাড়িত হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পরিব্রাজকদের সংখ্যা ক্রমে কমে যায়।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বিগ্রহের রূপ, মন্দিরের পরিকাঠামো, আচার উপাচারের ক্রমে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্রষ্টার সৃষ্টির কৃষ্টির উপর জনশ্রুতি একাকার হয়ে নানা কল্পকাহিনী এই মন্দির ও বিগ্রহকে নিয়ে জনমানসে ধর্মীয় আবেগ উদ্বেল করে তোলে।

বর্তমানে এই সৌধ ও বিগ্রহ তথা বর্গভীমা মন্দিরকে ঘিরে নানান জনশ্রুতি কিংবদন্তী পুরাণ ও ধর্মকথায় যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল- মহাভারতের যুগে তাম্রলিপ্তে যখন ময়ূরবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন, তখন ঐ বংশের দ্বিতীয় রাজা তাম্রধ্বজের নিয়োজিত এক জেলে-বৌ প্রত্যহ রাজপরিবারে মাছ সরবরাহ করত। একদিন একটি বনের মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে রাজবাড়ীতে আসার পথে সে একটি ছোট জলে ভরা গর্ত দেখতে পায়। স্বভাব বশত সেখান থেকে কিছুটা জল নিয়ে মাছের ঝুড়িতে দেয়। আশ্চর্যের ঘটনা হল, জল ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ির মধ্যকার মরা মাছগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা রাজার কানে যায় এবং তিনি একদিন জেলে-বৌ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে স্থানটি দেখার জন্য যান এবং জল-ভরা গর্তের জায়গায় একটি বেদী এবং তার উপরে দেবী মূর্তি দেখতে পান। রাজা তাম্রধ্বজ সেই দৃশ্য দেখে সেখানে দেবী পূজার ব্যবস্থা করে দেন।

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, বঙ্গদেশের কালাপাহাড়ের মত ভয়ানক হিন্দুবিদ্বেষীরও মূর্তি, মন্দিরনাশ থেমে গিয়েছিল এই মায়ের মন্দিরে এসে। আনুমানিক ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দুরন্ত কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয়ের পর বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তে প্রবেশ করেন, তিনি এই দেবীকে দর্শন করে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। কিংবদন্তি মেশা এই কাহিনী বিস্ময়কর। কালাপাহাড় (রাজীবলোচন রায় মতান্তরে কালাচাঁদ রায়) বাংলার ২৭ তম সুলতান সুলেমান কররানীর সেনাপতি ছিলেন। উড়িষ্যা অভিযান

কালে কালাপাহাড় মন্দির ও দেবদেউল ধ্বংস করে বঙ্গদেশে এগিয়ে চলেছেন রূপনারায়ণের দিকে। তটে শিবির খাঁটিয়ে বর্গভীমার মন্দিরের দিকে একা এগিয়ে চললেন কালাপাহাড়। মন্দিরের দেবীগৃহের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর মন্দির ধ্বংস করে, তাঁবুতে না ফেরায় তাঁবুর পাঠান সৈনিকরা স্তম্ভিত হন। তাঁরা মন্দিরে এসে দেখেন দেবী বর্গভীমার পদতলে আশ্রয় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন সুলেমান কররানীর সেনাপতি কালাপাহাড়। মূর্তিনাশক কালাপাহাড় জীবনে প্রথম ও একমাত্র মূর্তিকে ধ্বংস করতে এসেও ধ্বংস করতে পারেন নি, সেই মূর্তি আজও তমলুকের মন্দিরে আরতির আলোকে প্রতি সন্ধ্যায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই মন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করে খুশি হয়ে তিনি একটি দলিল বা বাদশাহী পাঞ্জা প্রদান করেন। দেবী বর্গভীমার মাহাত্ম্যের একটি এই উজ্জ্বল নজির কালাপাহাড়ের ঐ পাঞ্জা বর্গভীমা মন্দিরের সেবাইতদের আত্মকলহ নিরসনে মহামান্য ক্যালকাটা হাইকোর্টে জমা পড়ে। যা আজও ফেরত পাওয়া সম্ভব হয়নি ।

অপর একটি জনশ্রুতি যেমন, শিবপত্নী সতীর বাম গুল্ফ এখানে পড়ায় সেই থেকে এটি একান্ন শক্তিপীঠের অন্যতম বলে চিহ্নিত এবং দেবী বর্গভীমা এই পীঠের আরাধ্যা দেবী। দেবীর সেবায়েত পরিবারের মানুষজন এবং দেবীর পুরোহিতরা এই কিংবদন্তীটির কথা প্রায়শই শুনিয়ে থাকেন। এমনকি পঞ্জিকাতেও একথা উল্লিখিত রয়েছে। যদিও এর ঐতিহাসিকতা প্রতিষ্ঠিত নয়।

বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে অবস্থিত এই মন্দিরটির চারদিকে কিছু সংস্কার করা হলেও মূল প্রাচীন রূপটি অক্ষুণ্ণ। মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৬০ ফুট। এর দেওয়ালের ভেতরের প্রস্থ ৯ ফুট। এটি গোল ছাদ বিশিষ্ট। মন্দিরের চারটি অংশ—

- মূল মন্দির
- জগমোহন
- যজ্ঞ মন্দির
- নাট মন্দির।

তবে মনে করা হয় মন্দিরটির সব অংশ একসঙ্গে তৈরি হয়নি।

মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শৈলীতে সাতাশটি পোড়ামাটির বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। এ মন্দির রেখা দেউল রীতির। এখনকার রূপ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনো এক সময় এ মন্দির নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে এ মন্দিরের অনেক সংস্কার করা হয়েছে।
যজ্ঞ মন্দিরের সম্মুখে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে রানী কৃষ্ণপ্রিয়া নাটমন্দিরটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। নাটমন্দিরের দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট ও প্রস্থে ২০ ফুট। উচ্চতায় ১৫ ফুট কড়ি ও বর্গার চুন ও সুরকীর ছাদ। খিলানের উপরে চারপাশে মহামায়ার দশ অবতারের মূর্তি রয়েছে। মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু বেদীর উপর রক্ষিত রয়েছে একদা বৌদ্ধদের পূজিত দেবী পাথরের ব্রজতারা মূর্তি। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধদের উগ্রতারা মূর্তিটি পশ্চাতে রেখে তার অগ্রভাগে রূপা, সোনার নির্মিত ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত লালরঙের বসনে সুসজ্জিত কালী মূর্তির ন্যায় একটি অর্ধমূর্তি স্থাপন করে পূজিত হচ্ছে। দীর্ঘ জিহ্বা, একহাতে খড়া রয়েছে এই মূর্তিতে।

বৌদ্ধস্থাপত্যের ভিত্তিভূমি ও সৌধের উপর প্রতিষ্ঠিত দেবী কালী রূপে পূজিত হলেও অকালবোধন অর্থাৎ দুর্গাপূজার চারদিন বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়। মহানবমীর দিন পশুবলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের সময়কাল পর্যন্ত যুপকাষ্ঠ স্থাপন করে মহিষ ও পাঁঠা বলি দেওয়া হতো নিচে সোপানের অগ্রভাগের চাথালে। ষাটের দশকে তমলুকের কতিপয় পশুপ্রেমী স্থানীয় যুবক ও

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে রাস্তার ধারে চাথালে নবমীর বিশেষ বলি দেওয়া বন্ধ হলেও মন্দিরের উপরে স্থায়ী যুপকাষ্ঠে পশুবলি দেওয়ার রীতি আজও চলে আসছে। মানতকারীরা যেকোন দিন সকালে পশুবলী দিতে পারেন। বর্তমানে এই পশুবলী প্রথা এখনও চালু রয়েছে মন্দিরে।

শেষ কয়েক দশক থেকেই তমলুক কালীপূজার (দীপাবলি) জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে , পূজার রমরমাও চোখে পড়বার মত। এই দিন মন্দিরেও বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। ফলে ভক্ত সমাগমও প্রচুর হয়। যুগ যুগ ধরে তমলুকের অধিষ্ঠাত্রীদেবী রূপে মা পূজিত হয়ে আসছেন। যদিও অতীতে এই তল্লাটে শক্তিপূজা নিষিদ্ধ ছিল । তবে সেবাইতদের এই আদেশ ভেঙ্গে শহরের অভ্যন্তরে প্রথম শক্তিপূজা (দুর্গা পূজার)প্রচলন করে আবাসবাড়ী ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ন-এর সদস্যরা আনুমানিক ১৯৫০-৬০ সাল নাগাদ। ঐ সময় বর্গভীমা মন্দির সেবাইত ও ক্লাব কর্তাদের মধ্যে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলেও তা বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যস্থতায় একটি শর্তে এই প্রথার অবসান ঘটে। শর্তটি হলো- শহরের অভ্যন্তরে ও পার্শ্ববর্তীতে কোন শক্তিপূজা হলে পূজার আগে বর্গভীমা দেবীকে পূজা দিতে হবে ।
পরবর্তীতে শহরে ও জেলায় শক্তিপূজার চল শুরু হয়। এখনও নিয়ম মেনে সমস্ত শক্তিপূজা কমিটি পূজার শুরুর পূর্বে দেবী বর্গভীমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে যায়।

দেবী বর্গভীমা নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভক্তদের কাছে পূজিতা হন। বিশেষ করে তমলুক শহরবাসীর কাছে দেবীর মর্যাদা অন্যান্য যে কোন দেবী-দেবীর তুলনায় অধিক। তাই দেখা যায় প্রত্যহ বহু নরনারী দেবীর নিকট পূজা নিবেদন করেন এবং অঞ্জলি দেন। কলকাতা ও ভিন্ন জেলা থেকে আগত দর্শনার্থীদের ভিড়ও চোখে পড়ার মত। মন্দির সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। পুরোহিত ও সেবায়েত পরিবারের লোকজন দর্শনার্থীদের পূজা দেওয়াতে সাহায্য করেন। প্রত্যহ দুইবার সকালে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীকে পূজা করেন। প্রত্যহ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবীর ঘুম ভাঙানো হয় এবং তারপর স্নানপর্ব পালিত হয়। তারপর নতুন শাড়ী পরানো হয় এবং সোনা ও রূপার বিভিন্ন গহনা পরিয়ে দেওয়া হয়। রূপ সজ্জার পর ব্রাহ্মণরা প্রভাতী পূজা করেন। প্রতিদিন দুপুরে দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। অন্নভোগে বিশেষ হিসেবে শোল মাছের টক থাকে। দুপুরের অন্নভোগের পর দুঘন্টা মূল মন্দিরের তথা গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ



থাকে। প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন আরতির ও পূজার সময় দেবীকে ফলাহার ও মিষ্টান্ন দেওয়ার রীতি চলে আসছে।

বিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে এক স্বল্প সঞ্চয় সংস্থার অর্থানুকূল্যে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির পরিবর্তন ঘটে তিরিশ ধাপ হয়েছে। মূল মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে দক্ষিণ দিকে ২টি নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থান পেয়েছে। সম্প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমে বিবাহবাসর, উপনয়ন, অন্নপ্রসাদ বিতরণ ও ভক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। দক্ষিণে চারতলা বিল্ডিং-এর কাজ চলছে দর্শনার্থীদের রাত্রিযাপনের জন্য।

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্যটি বা জনপদটি নানা নামে পরিচিত ছিল যেমন - তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তি, দামলিপ্তি, তাম্রলিপ্তক, তমোলিপ্তি, ইত্যাদি। কোথাও 'বিভাস' বা 'বিভাসক' তমলুকের কোন নাম হিসেবে উল্লিখিত হয়নি। আবার মধ্যযুগের কোন পুস্তকেও বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলিতে তমলুক বা তাম্রলিপ্ত 'বিভাস' বা 'বিভাসক' রূপে উল্লিখিত হয়নি।

তাম্রলিপ্তের ন্যায় প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থলে কোন প্রাচীন পীঠস্থান থাকলে আজ তা অতীতের কোন না কোন সংস্কৃত পুস্তকে বা চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে উল্লিখিত হত। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন সাহিত্যিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই সতীর দেহাংশ থেকে গড়ে ওঠা পীঠস্থান হিসেবে দেবী বর্গভীমা মন্দিরটিকে স্বীকৃতি দানের পথে এটি সবচেয়ে বাধা হয়ে উঠেছে।

ওমেনসিয়া

- সঙ্গীতা গাঙ্গুলী

শীতের রোদে ছেলেবেলার কমলালেবুর ঘ্রাণ,
পড়ন্তবেলায় মায়ের মুখের মিষ্টি পানের সুবাস।
জন্মদিনের দুপুরে পিঠ ছাপানো ভেজা চুলে
মায়ের পায়েস রান্না-সে গন্ধ এখনো টাটকা।
ফেটানো ডালবাটায় ঠাকুমা বড়ি দিল এইমাত্র-
লালমার্কিন লেপ রোদ পোহায় আপাদমস্তক।
অলস শীত দুপুরে আমি পাহারায়,
হাতে "আবার যখের ধন"পাতায় পাতায় ছাপা " পাতা মুড়িবেন না"।
"বোরোলীন" আর " তুহিনা"র গন্ধ মেখে "আনন্দমেলা"য় ঝুঁকে
"ছবির পাঁচটা অমিল" খুঁজতাম...

সবকিছু সাজানো আছে পরপর। স্বাদ-গন্ধ-শব্দের অটুট মিশেলে
দৃশ-সীমানায় জীবন্ত সে অতীত।

অথচ, গতকাল হারিয়েছে যাবতীয় ইতিবৃত্ত।
মাথা খুড়লেও মনে পরেনা দরকারী কাগজ
অথবা বিয়েবাড়িফেরত ঝুমকোটা
সযত্নে রেখেছি কোথায়!
অন্ন-ব্যঞ্জন পুড়ে ছাই হলে 'পরে
মগজ মালিক ডাক পাঠায়।
কিন্তু ঝাপসা বিস্মৃতির মাঝেও স্মৃতির উজ্জ্বল উৎসমুখ খুলে যায়,
কিশোরী বেলার কয়েৎবেল মাখার গন্ধ মনে জাগলে
অব্যর্থ প্রতিবর্তক্রিয়ায় মুখ টকে যায়।

নির্যাতিতা

- সৌম্যদীপ মহাপাত্র

যে মেয়েটা রোজ সকালে
স্টেথ হাতে বেরোয়,
সেই মেয়েটাই দিন পোহালে
রান্নাঘরে যায়।
সকাল হলেই হুকুম তামিল
তার খুশিরা মৃত
সংসারের এই বন্ধ সেলে
সে যেন এক ধৃত।

এইচ এস টা পাশ করেছে
ডাক্তারিতে মন
জর্জ হবেনা, অফিসারও না
চিকিৎসাই জীবন।
সরকারিতে চান্স পেয়েছে,
বাড়ির সবাই খুশি,
কলেজটাতে পৌঁছে গেছে,
ভয় কেন আর পুষি?

কেই বা জানতো কলেজ যাওয়াই
কাল হবে তার প্রাণে?
কলেজটা যে আস্ত নরক
কেই বা করবে মনে?
দিন-রাত-ভর দেদার ডিউটি,
শান্তিও নেই বসে,
দেড় দিন পর বসতে গিয়ে
প্রাণটা গেলো ধ্বসে।
দশজন মিলে অত্যাচার
কেমনে পারে সইতে?
বয়সটা যে তার অতি অল্প,
পারতোনা কি ওরা সবাই
প্রাণ ভিক্ষা দিতে?
দুমড়ে মুচড়ে শরীরটাকে
খুবলে খেয়েছে ওরা,
মানুষরূপী পশু ওরা,
শেষ করেছে ওর জীবন ভোমরা।

ডাক্তারিতা নয়তো বা তার
স্বপ্ন হয়েই গেলো,
বিচারটাও কি পাবে না সে?
অপরাধীরা পালিয়ে গিয়ে
কোথায় গা ঢাকলো?
এমনটা যদি হতেই হয়,
তবে সবার স্বপ্ন উঠুক এজলাসে।
একা কেন ওকেই কেবল
মরতে হবে নির্দোষে?

মোমবাতি মিছিল চলবে না আর,
গান্ধীজির আজ গেছে দিন,
এবার আসুক বীর সুভাষ,
বিদ্রোহ ছাড়া পথ কঠিন।
সুবিচার তো দিতেই হবে,
আর কতদিন সইবো?
সবাই কি তবে এদের মতো,
নির্যাতিতাই থাকবো?

মা আসছে

- পার্থ প্রতীম ঘোষ

বর্ষার পরে আসে শরৎ,
আনন্দে মেতে ওঠে সমগ্র বিশ্ব জগৎ |
আকাশে চলে আলো আঁধারের খেলা,
গগনের মাঝে উঁকি মারে পেঁজা তুলার ভেলা |
নদীর তীরে জেগে ওঠে কাশের নৃত্য,
শিউলীর গন্ধে চারিদিক মত্ত |
শিশির ভেজা সকালের স্নিগ্ধতা,
চলছে কুমোরপাড়ার ব্যস্ততা |
কেননা “ মা “ আসছেন সপরিবারে,
নতুন পরিধানে আনন্দ হবে এবারে |
আসে পঞ্চমী - তারপরে ষষ্ঠী ও সপ্তমী,
বেজায় খুশী লক্ষ লক্ষ নর-নারী |
অষ্টমীতে মন্ডপে মন্ডপে চলে পুষ্পাঞ্জলী,
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব্বাই ঠাকুর দেখতে চলি |
নবমীর পর আসে ভাসানের পালা,
কোলাকুলির সাথে চলে সিঁদুর খেলা |
আকাশে বাতাসে ভেসে ওঠে বিষাদের সুর,
অপেক্ষা...... অপেক্ষা “ মা “ আসবেন আরও একবছর পর।

রাতের জোনাকি

- শুভেন্দু সামন্ত

অন্ধকারেই এলে,অন্ধকারেই হারিয়ে গেলে
কে জানে, অন্ধকার হয়েই তুমি আলো কেড়ে নিলে
তুমি কি সেই অচিন পাখি যে আলোর দেশে অন্ধকার...
অন্ধকারের আলো হয়ে রইলে,
কালোর সেই দৃষ্টি তে, হারিয়ে যাওয়া ঘন কুয়াশায়
পাহাড়ি বৃষ্টি হয়ে রইলে, যেনো দৃষ্টিহীন কোনো
মৃতপ্রায় কাকের কর্কশ কণ্ঠ কেড়ে নিলে ,শুরুর
বসন্তের আগের সেই হিম শীতের শুকনো পাতা কেড়ে নিলে
যদিও হায়না বিচ্ছেদ শব্দের , বিচ্ছেদ হয় মনের
তাইতো ওই কালো পাখির মন বলে ...
হিমেই এলে, অন্ধকারেই হারিয়ে গেলে
কোনো এক সময়ের ঘড়ির কাঁটার বিচ্ছদের
বেদনায় অন্ধকারে তলিয়ে গেলে...
তুমি অন্ধকারেই এলে,
অন্ধকারেই হারিয়ে গেলে!

অগ্নিকন্যা

- সম্প্রীতি দত্ত গুপ্ত

তোমার মনে আছে আমায়?
মনে আছে, ছেলেবেলায় সেই কাটানো
মুহূর্তগুলো?
যেগুলো প্রতিদিন আমায় আঘাত দিত
দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দেওয়ার সেই স্মৃতি?

প্রত্যেকটা আঘাতের দাগ?
তোমার মনে আছে?
আমায় নিয়ে দিনের পর দিন কতই না খেলা
হয়েছিল,
আমি কিছু বলিনি -
শুধু দিনের পর দিন রাতের পর রাত শুধু
কেঁদেছিলাম
একা একটা চোখের জল ছিল
হয়তো আমার রক্তবিন্দু,
মনে আছে আমায়?
আমি এক সামান্য নারী, যার নাম অগ্নিকন্যা
মা সাধ করে ডাকতো অগ্নি,
তখন বুঝিনি এই নামের মানে
আজ বুঝেছি, আগুন!

যখন সবাই এক এক করে আমার পাশ থেকে
দূরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল,
যেদিন আমায় নিয়ে
ছেলেখেলা করেছিল সবাই,
বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল আমায়
যে মেয়ে হয়ে জন্মানো টাই আমার পাপ,
অন্যায়
টানতে টানতে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল
আমায়,
সেদিন বুঝেছিলাম
আমি অগ্নিকন্যা।
আমার নামের মানেটা কি,
আগুনের মতোই ঝলসে গিয়েছিলাম আমি,

কিন্তু মরিনি।
মায়ের কথাগুলো মনে রেখে
নতুন জন্ম হয়েছিল আমার।

মা বলেছিল -
অগ্নি!
হার মানবি না,
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখবি।
যারা তোকে নিচে নামাতে চেয়েছিল,
তাদের তুই নিচে নামাস।
হয়তো সেই কথাগুলোর মধ্য দিয়েই জন্ম
হয়েছিল আমার,
নতুন জন্ম!
নিজের দুঃখ কষ্টের মাঝেও নিজেকে তৈরি
করেছিলাম,
অগ্নিকন্যার মত।
তোমার মনে আছে আমায়?
আমি অগ্নিকন্যা,
মৃত্যুর মাঝে যার নতুন জন্ম হয়েছিল।।

বৃষ্টির কথা

- অতসী ঘোষ

আমি চলেছি শূন্যের রাস্তা ধরে,
আমি চলেছি শুষ্ক ধরণীর তরে,
আমি এসেছি সুফলের বার্তা নিয়ে,
আমি এসেছি দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান নিয়ে;
আমি থেকেছি শ্যামল বনানীর বক্ষ মাঝে,
আমি আছি অনর্গল বারিধারার নিশান হয়ে,
আমি আছি ভালোবাসার ছন্দে,
আমি কবির কলমে, শিল্পীর চিত্রপটে
সুরের ঝংকারে, নূপুরের তালে;
আমি মিলিয়ে যাই মাটির পরে,
মেঘের প্রণয় লিপি বয়ে,
আকাশ বলে কথা, সজল আখরে,
ধরিত্রী আঁকে ছবি, প্রত্যাবর্তনের প্রতিক্ষা
নিয়ে।

তোমার জন্য

- কাবেরী চক্রবর্তী

তুমি বলেছিলে,একমুঠো আকাশ আনবে
আমার জন্য।
তুমি বলেছিলে পৃথিবীর সব সুখ মুঠো ভরে
আনবে আমার জন্য।
তুমি বলেছিলে, আমার সব বিপদে তুমি আছ
আমার পাশে।
তুমি বলেছিলে....

আমি জানতাম না মুঠোয় ভরা যায় না আকাশ
আমি জানতাম না, মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে
যায় সব সুখ,
আর তুমি পাশে না থাকাই সব চেয়ে বড়
বিপদ।।

তুমি বলেছিলে,গজ মুক্তো এনে দেবে আমায় -
স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়ে যে মুক্তো জন্মায়।
তুমি বলেছিলে, সেই ঝর্ণার জল আমায় এনে
দেবে -
যে ঝর্ণার জলে স্ফটিক তৈরি হয়।
তুমি বলেছিলে.....

কিন্তু অনেক বলা কথাও
না বলা কথা হয়ে যায়,
মুছে যায় জীবন থেকে সব প্রতিশ্রুতি..
আমি তো জানতাম না গজ মুক্তো বলে কিছু
নেই,
ঝর্ণার জলে স্ফটিক তৈরি হয় না।
কিন্তু বিশ্বাস করতাম তোমাকে...
গজ মুক্তো তো আমি পেয়েই গেছি সেদিন,
যেদিন গজ মুক্তোয় বিশ্বাস এনে দিয়েছিলে
তুমি।।

তাই গজ মুক্তো না দিতে পার
বিশ্বাস তো দিয়েছো তুমি,
এই বিশ্বাস টুকু নিয়েই বেঁচে থাকতে দাও,
বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া বড় কষ্টের।।

বিদূষক

অর্ণব চ্যাটার্জ্জী

মুখে তার রং মাখা, নাকটি বেশ লাল,
এই ভাবেই রেখেছে নিজ স্বরূপ আড়াল,
বছর বছর ধরে –
সে এক বিদূষক – বিভিন্ন খেলায়,
বিভিন্ন লীলায়, বিভিন্ন রঙের জামায়,
কিছু ভেঙে পড়া মানুষকে রাস্তা দেখায়।
এই বিদূষক আজকে কোথায়?
যখন শহরের এই বড় দীর্ঘ রাতে
এক হিমেল হাওয়া আঁকড়ে ধরেছে।
এক শীতল মৃত্যু জাগিয়েছে কিছু প্রশ্ন
ভেঙ্গে যাওয়া কিছু স্বপ্ন নিয়ে, চূর্ণিত
কিছু সুরক্ষায় যা পুড়েছে রক্তমাখা চিতায়।
সেই কলঙ্ক-মুখী কিছু নির্বাক পাণ্ডবদের
আবার বিদূষক দেখবে কোনও অবতারে,
দেখবে বিচার নামক রঙ্গমঞ্চের তামাশায়।
শহরের আরশি মাঝে শত শত মুখ
রোজ হারীয়ে যায় সভ্যতার অস্ত্রাঘাতে,
আর বিদূষক তাদের কর্মের ফল।
অস্ত্র আর কর্মের মাঝে দেখানো দিশায়
সমুদ্রের সব জল যেন আছড়ে পড়বে,
আর তাতে চেনা শরীরের শব দেহ ভেসে
উঠবে।
তবে এর শেষ কি উল্লাসে শিকড় গুলো
উপড়ে ফেলায়? নাকি দিশাহিন ভাবে
নির্বোধ প্রতিক্রিয়ায়? কিংবা হাওয়ার দিকে
চলতে গিয়ে প্রবৃত্তির পচনে? তাই – কোথায়
গেলিরে বিদূষক, একবার এইদিকে আয়রে!
মুরলী ধ্বনিতে কিংবা কোনও খেলায়
এই ফাঁপা মানুষের মাঝে একটু প্রাণ দিয়ে
যা।।

বয়সে তুড়ি মেরে

- সুনীল কুমার মণ্ডল

এখনও কি দিল হুম হুম করে
একটা ওড়না ঢাকা দুটো মুখ।
এখনও কি চোখ মুছিয়ে দেয়
গভীর দুখে ভাসবে যখন বুক।।

এখনও কি তোমার তুলসী বনে
শাঁক বাজানো মুখে প্রদীপ জ্বলে।
হাতটা ধরে কাছে টানার সময়
লজ্জা-ভয়ে ‘কি দুষ্টু কি’ বলে।।

পূর্ণিমাতে এখনও চাঁদ নামে
দু’জন ছাদে মুখোমুখি হয়ে।
এখনও কি নিকষ গভীর রাতে
চাঁদের মতো দু’জনে যাও ক্ষয়ে।।

তবে,দু’টির বয়স যতই হোক
ভালো বাসায় ভালোবাসা বাঁধা।
যমুনাতে থাক না পরকীয়া
তোমার পাশে তিনিই তোমার রাধা।।

দেখিনি কখনও

- দেবজ্যোতি সরকার

দেখিনি কখনোও আকাশে
পূর্ণিমার চাঁদ।
দেখিনি কখনোও আকাশময় তারাদের দেশ।
দেখিনি কখনোও ভোরের আলোয় মাখিয়ে দেওয়া
কমলা আকাশ।
দেখিনি কখনোও দিঘির পাড়ে অস্তমিত সূর্যের দেশ।
দেখিনি কখনোও বৃষ্টি ভেজা মাটি,
আকাশের রং।
দেখিনি কখনোও ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে
চলে যাওয়া সেই সাপটাকে।
দেখিনি কখনোও কলরব করা পাখির বাসা।
দেখিনি কখনোও বৃষ্টির দিনে
কাঁপতে থাকা সেই কুকুর ছানাটাকে।
দেখিছি কেবল সোস্যাল মিড়িয়া, গাড়ির ধোঁয়া,
বড়ো বড়ো ইমারত,

আর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই টেবিল আর চেয়ারটাকে।

অন্তবিহীন

- শ্রীমান

খুঁড়ে পাওয়া এই প্রত্নতত্ত্ব ভিড়ে
খুঁজবে কোথায় ইতিহাস জানা লোক
এই জীবনের মেয়াদ যখন দিলেই
কষ্টগুলোও উদযাপিত হোক...

বিজ্ঞানীরা চলুক অঙ্ক মেপে,
হৃদয় কি আর হিসেব বোঝে ছাই,
আমরা যারা ভীষণ অভিমানী...
স্বপ্ন দিয়েই পাহাড় গড়ে যাই।

মাশুল দিতে প্রাচীন কোনো ভুলের,
অতীত খোঁজার প্রসঙ্গ বাদ যাক,
ইতিহাসটা পারলে জেনো তুমি,
কাব্যটুকুই আমার হয়ে থাক।

যখন তুমি স্তব্ধ শোকের দেশে
আমায় পাবে রাত-জোনাকির ভিড়ে,
মেয়াদ যখন অল্পদিনেই বাঁধা,
জীবন নেবো জীবন থেকেই কেড়ে।

শরৎকাল

- অপরাজিতা ভট্টাচার্য

শরৎকালে দিকে দিকে কাশফুল ফোটে,
পুজোর দিনে ঘরে ঘরে শঙ্খ বেজে ওঠে।
নতুন জামা কেনা শুরু পুজোর আগে থেকে,
ঘরে বসে মন থাকেনা, নতুন জামা দেখে।
পুজোর সময় নেই তো কোনো স্কুলের বকাবকি,
পথে পথে ঢাক নিয়ে বেরিয়েছে আজ ঢাকি।
রাস্তায় পড়েছে আজ চোখ ধাঁধানো আলো,
প্যান্ডেলেতে ঝাড়বাতি মানাচ্ছে যে ভালো।
দোকানগুলোয় বসেছে আজ কত ভাজাভুজি,
কেউ ছাঁকছে চপ আর কেউ ছাঁকছে লুচি।
শরৎকালে আকাশখানা সাদা মেঘে ঢাকা,
শিউলিতলায় শিউলিফুল আর ধুনোর গন্ধ মাখা।
মাইকে কেবল পুজোর গান বাজছে অবিরাম,
মায়ের আগমনে স্নিগ্ধ এই ধরাধাম।
মহালয়ার পর থেকে দেবীপক্ষ শুরু হয়,
তখন কি আর বিষন্নতা, দুঃখ মনে রয়?
চার দিনের এই আনন্দ কি বলে বোঝানো যাবে?
সারা বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটবে।
সারা বছরের অপেক্ষা শেষ হবে এই শরৎকালে,
মন মাতিয়ে দেবে মা ঢাকের তালে তালে।
শরতের সাদা মেঘের কোলে লুকিয়ে আছে স্মৃতি,
হৃদয় মাঝে ফুটে উঠেছে আলোর পুনরাবৃত্তি।
পুজোর দিনে চাইনা আমি সোনা, দানা, মনি,
মহালয়ার সকালবেলায় মায়ের আগমনী।
নতুন রূপে নতুন ভাবে আসবে মা এ - ধরায়,
বসুন্ধরা পূর্ণ হবে - মন যে কেমন করায়।

প্রেমিকা

- মঙ্গল চন্দ্র রাউৎ

আমি চাই আমার একটা
নব্বই দশকের প্রেমিকা হোক
হাজার ছেলের ভীড়েও তার দৃষ্টি শুধু
আমার দিকেই আটকে থাকুক

আমি চাই প্রতি সাপ্তাহে একদিন সে
নিয়ম করে আমায় চিঠি লিখুক
নিষ্পাপ দৃষ্টি আর চোখের কাজল লাগানো
মানুষটির মধ্যে লেখিকা লেখিকা ভাব থাকুক।

আমি চাই চিঠির পরতে পরতে
মাতাল করা ছন্দ থাকুক
ভালোবাসায় ঘেরা শব্দগুলো-
অনুভূতিতে আমায় জড়িয়ে রাখুক।

আমি চাই আমাদের একটা
চায়ের আড্ডার বিকেল হোক
বৃষ্টিতে ভেজা রোমান্টিক মুহূর্তের জন্য
তার অনেকটা থাকুক ঝোক।

আমি চাই অপেক্ষার প্রহর শেষে
মাসে একদিন আমাদের দেখা হোক
জমিয়ে রাখা কথা বলতে বলতে
বিকেল গড়িয়ে সূর্যাস্ত করি উপভোগ।

আমি চাই আমাদের একটা-ই
নির্ঘুম রাতের গল্প হোক
প্রেমের দিন গুলোতে মিস করা অনুভূতি গুলো
বাসর রাতে গল্প করতে করতে প্রকাশ হোক
"আমার একটা নব্বই দশকের প্রেমিকা হোক"

মিক্সব্যাগ

সংকলনে - দীপ সুন্দর দিন্ডা

১। হুগলী নদীর উপর নির্মিত এই সেতুটি হাওড়া সহ দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের কলকাতা আসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগাযোগ মাধ্যম, যেটি ১৯৯২ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও উদ্বোধন করেন। কোন সেতু?
উত্তর: দ্বিতীয় হুগলী সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু

২। ইনি ছিলেন কর্নগড়ের রাজা অজিত সিং এর রানী, চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতৃ। তাঁকে বলা হয় মেদিনীপুরের লক্ষীবাঈ। তাঁর সম্মানে ভারতীয় রেল হাওড়া থেকে আদ্রা পর্যন্ত একটি ট্রেনের নামকরণ করেছে। কি নাম এই বীরাঙ্গনার?
উত্তর: রানী শিরোমণি (শিরোমণি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার)

৩। ব্ল্যাক আইভরি কফি হল পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কফি, যেটি প্রস্তুত করে থাইল্যান্ডের ব্ল্যাক আইভরি কোম্পানি। আনুমানিক এক কাপ কফির দাম প্রায় 50 মার্কিন ডলার। এই কফি তৈরীর মূল উপাদান কি?
উত্তর: হাতির মল থেকে

৪। গ্যালিলিওর মৃত্যু ৮ ই জানুয়ারি ১৬৪২ সালে। ঠিক তার তিনশ বছর পর এই মানুষটির জন্ম, ৮ ই জানুয়ারি ১৯৪২। আর তিনি মারা যান অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের ১৩৯ তম জন্মদিনে ১৪ মার্চ। কার কথা বলা হচ্ছে?
উত্তর: স্টিফেন হকিং

৫। জাতিসংঘের উদ্দ্যোগে ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেইরোতে ১৯৯২ সালে ৩ রা জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত পরিবেশ উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয় নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কি নাম ঐ সম্মেলনের?
উত্তর: বসুন্ধরা সম্মেলন

৬। বলাগড় বন্দরটি একটি নদী বন্দর, যেটি ভাগীরথী ও হুগলী নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রাচীনকাল থেকে এই বলাগড় বন্দরটি কোন জিনিস তৈরির জন্য সারা বঙ্গ দেশে বিখ্যাত?
উত্তর: নৌকা

৭। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা ও কিন্তু কোনও অংশে পিছিয়ে ছিলেন না। ঠিক সেরকম ইন্দুমতী নামের এই কিশোরী ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর বোন। তিনি বিপ্লবীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে আর এজন্য তিনি কারারুদ্ধও হয়েছিলেন। তাঁর দাদা ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের একজন বিপ্লবী। কি নাম ঐ দাদার?
উত্তর: অনন্ত সিং

৮। রাজা নলের স্ত্রী দময়ন্তী, কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী রুক্মিণী, ঋষি অগস্ত্যের স্ত্রী লোপামুদ্রা, এবং রাজা দশরথের মাতা ইন্দুমতী, আর মহাভারতের ভীম (মধ্যম পান্ডব নয়) এরা সবাই ছিলেন একটি রাজ্যের রাজকন্যা বা রাজা। কোন রাজ্যের?

উত্তর: বিদর্ভ

৯। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে উইকেট কিপার ছাড়া আর মাত্র তিন জন খেলোয়াড় ২০০+ ক্যাচ ধরার কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন। তাদের মধ্যে দুজন হলেন - রাহুল দ্রাবিড়, মাহেলা জয় বর্ধন, তাহলে তৃতীয় জন কে?

উত্তর: জ্যাক ক্যালিস

১০। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিসগড় সহ এতগুলো রাজ্যের প্রায় চার কোটি মানুষ কথা বলে এই ভাষায়। কেন্দ্রীয় সরকার এই ভাষাকে এখনও স্বীকৃতি না দিলেও ঝাড়খণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে এই ভাষায় পড়ানো হয়। এই ভাষায় গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থেরর অনুবাদও হয়েছে, যার নাম - গীতক নেহর, যেটি অনুবাদ করেছেন অভিমন্যু মাহাতো এবং এই গীতক নেহর এর ভুমিকা লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ। এটি কোন ভাষা?

উত্তর: কুড়মালি ভাষা

১১। সন্ধ্যা, সরস্বতী, ত্রিধামূর্তি, কালীকা, শুভগা, উমা, মালিনী, কুব্জিকা, কালসন্দর্ভা, অপরাজিতা, রুদ্রানী, ভৈরবী, মহালক্ষী, পীঠ নায়িকা, ক্ষেত্রজা, অন্নদা/ অম্বিকা
এগুলো কাদের নাম?

উত্তর: কুমারী পূজার সময় বিভিন্ন বয়সী কুমারী দের নাম

১২। ইন্সটিটিউট লি রোজি হল পৃথিবীর সবচেয়ে দামি স্কুল। প্রতি শিক্ষার্থীদের বছরে ফি বাবদ প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার দিতে হয়। এই স্কুল কে বলা হয় রয়্যাল স্কুল। এটি কোন দেশে অবস্থিত?

উত্তর: সুইজারল্যান্ড

১৩। ব্যাঙ্গ কবিতা রচনার জন্য ইনি ছিলেন বিখ্যাত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ নিয়ে ইনি ছিলেন ভীষণ গোঁড়া এবং ওনার স্ত্রী শিক্ষা বিষয় কে নিয়ে ব্যাঙ্গ করে লিখেছিলেন,
“আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, ব্রত ধর্ম করত সবে, একা বেথুন এসে শেষ করেছে। আর কি তাদের তেমন পাবে?” এবং শোনা যায় যে ওনার পান দোষ ছিল, সুরাপান করলেই কবিতা বেরিয়ে আসত। কে তিনি?

উত্তর: ঈশ্বর গুপ্ত

১৪। আলী সিকান্দার হলেন একজন উর্দু কবি ও গজল লেখক (১৮৯০ থেকে ১৯৬০) তাঁর কবিতা সংকলন, আতীশ-ঈ-গুল, এর জন্য ১৯৫৮ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় ব্যাক্তি হিসেবে ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। উনি পরিচিত ছিলেন জিগার______ নামে। কোন নামে?

উত্তর: জিগার মোরাদাবাদী

১৫। ১০০ টি ক্যাচ, ১০০ টি উইকেট এবং ১০০০ রান টেস্ট ক্রিকেটে এরকম নজির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মোট ছয়জন খেলোয়াড়। তাদের মধ্যে পাঁচজন হলেন - স্যার গ্যারি সোবার্স, ইয়ান বোথাম, শেন ওয়ার্ন, কার্ল হুপার, জ্যাক ক্যালিস, তাহলে আর একজন কে?
উত্তর: জেমস এন্ডারসন

১৬। এর দশকে তৈরী হওয়া এই বলিউড ছবিটিতে বেশ কোলকাতা দার্জিলিং ছোঁয়া রয়েছে। নায়িকা এখানে মা ও মেয়ের দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটির মূল গল্প AJ cronin এর t judas tree অবলম্বনে নির্মিত। কোন ছবি?
উত্তর: মৌসম

১৭। 15653/54 হল একটি এক্সপ্রেস ট্রেন, যেটি ভারতের গুয়াহাটি থেকে জম্মু তাওয়াই এর মধ্যে চলাচল করে সপ্তাহে একদিন করে। এই ট্রেনটির একটি নাম রয়েছে যেটি একটি তীর্থস্থানের নামে। ট্রেনটির নাম কি?
উত্তর: অমরনাথ এক্সপ্রেস

১৮। "সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে/ সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত যেমতি লোক নিশার স্বপনে/ শোনে মায়া যন্ত্র ধ্বনি তব কলকলে,"
কবি বা কবিতা র নাম কি?
উত্তর: কপোতাক্ষ নদ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৯। অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে পদক জিতেছে সান মারিনো ২০২০ টোকিও অলিম্পিক গেমসে। তাহলে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার কোন দেশ যারা এখনও পর্যন্ত একটিও পদক জয় করতে পারে নি?
উত্তর: বাংলাদেশ

২০। ময়নাগুড়ি থানা এলাকার চুয়া ভান্ডার গ্রামের গ্রাম্য দেবতা ইনি। মুসলিম দেবতা অর্থাৎ তিনি পীর দেবতা। গ্রামে কারও বাড়িতে নতুন গাই বিয়োলে বা নতুন বাছুর হলে এনাকে পুজো দিতে হয়, নাহলে নাকি বাছুর লুকিয়ে দেয় বলে এরকম বিশ্বাস। নৈবেদ্য: দুধ, কলা, মৃন্ময় মুর্তি নেই। সারাবছর যে কোনো সময় তার পুজো দেওয়া যেতে পারে। ইনি কোন দেবতা?
উত্তর: চামার দেবতা

২১। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটার মুত্তিয়া মুরলীধরন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার ডারেন স্যামি, এবং ভারতের ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরন, এই তিনজন ক্রিকেটারের মধ্য কি মিল রয়েছে যা আর কোনো ক্রিকেটারদের নেই?
উত্তর: এরা সেই তিনজন ক্রিকেটার যারা তাঁদের নামে নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামে খেলেছেন

২২। হার্শেল গিবস, মিঠুন মানহাস, মনীষ পান্ডে, শিখর ধাওয়ান, ইয়ান মর্গান, নিকোলাস পুরাণ, এরা সবাই এক সিজনে ৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সবার উপরে কে আছেন যিনি ৫ বার হয়েছে?
উত্তর: যশ বাটলার

হিন্দু-পুরাণ

সংকলনে - মৃণাল শাসমল

১। দেবী ভাগবত পুরান অনুসারে
"দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাং হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ- বন্দেহং সাষ্টনাগামুরু কুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্।"
অর্থাৎ মাতা মনসা হলেন সর্পকুলের জননী, চন্দ্রবদনা, সুন্দর কান্তি বিশিষ্টা, বদন্যতাগুণসম্পন্না, হংসবাহিনী, উদার স্বভাবা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বদা অভিষ্ট প্রদায়িনী, সহাস্য বদনা, কণকমনি এবং নাগশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা ভূষিতাঙ্গী, অষ্টনাগ পরিবৃতা, উন্নত কুচযুগল শোভিতা, ভোগিনী, কামরূপা দেবীকে সদা বন্দনা করি। উক্ত পুরান মতে দেবাদিদেব মহাদেব মনসা দেবীকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করে সামবেদ অধ্যয়ন করিয়ে এই দেবতা x র উপাসনা করতে নির্দেশ দেন। সে নির্দেশনা অনুসরণ করে দেবী মনসা পুষ্কর তীর্থে গিয়ে তিন যুগ ধরে x র অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করেন। দেবীর আরাধনায় এই দেব x প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দেন এবং আশ্চর্যজনক ভাবে মাতা মনসার প্রথম পুজো করেন ও তুমি ত্রিলোকে পুজিতা হও এই সিদ্ধি প্রদান করেন।এরপর একে একে মুনি কশ্যপ,মহাদেব ও অন্যান্য দেবতারা মাতার পুজা চালু করেন।প্রশ্ন হল কে এই x?
উঃ-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

২। হিন্দু পুরান তথা মহাভারতের একটি কাহিনী অনুসারে এই মহাভারতের চরিত্র ছিলেন মা কালীর খুব বড় ভক্ত। ইনি মা কালীর ধ্যান করা কালীন সময়ে নিজের শরীরের অস্থি মাংস কেটে কেটে যজ্ঞ কুন্ডে দিতেন আর এতে মা কালী খুশি হয়ে এনাকে অনেক সোনা দিতেন যা ইনি গরিব দের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এখানে তপস্যা করতে করতে ইনি একবার নিজের মুণ্ড ও কেটে মা কালীকে দান করেছিলেন। এতে মা কালী খুশি হয়ে এনাকে জিবীত করার পাশাপাশি অজেয় হবার বর ও প্রদান করেছিলেন প্রশ্ন হল ইনি কোন বিখ্যাত চরিত্র?
উঃ-কর্ন

৩। হিন্দুপুরান তথা দেবী ভাগবাত পুরান অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দেবী রুক্মিণীর একটি মাত্র কন্যা ছিল। যিনি কৃতবর্মার পুত্র বালীকে বিয়ে করার জন্য পরিচিত। কৃতবর্মা মহাভারতের নায়ক। তিনি যদু বংশের যোদ্ধা ছিলেন। তার পুত্র বালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে পড়েছিলেন। এই কন্যা মহৎ গুণাবলী এবং মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃদেবী শ্রীলক্ষ্মী-দেবী রুক্মিণীর মতো ছিলেন। যখন দেবী রুক্মিণী শ্রী কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তাদের ১০ টি পুত্র এবং একটি মাত্র কন্যা, তখন ভগবান কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন: এক কন্যা দশ পুত্রের সমান। একটি কন্যা মা এবং বাবার জন্য এত বড় সুখ নিয়ে আসে, যা শুধুমাত্র ১০ টি পুত্র একসাথে পিতামাতার জন্য আনতে পারে। প্রশ্ন হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কন্যার নাম কি?
উঃ-চারুমতী

৪। হিন্দুপুরান তথা শিবপুরান অনুসারে দক্ষযজ্ঞে অপমানিত হয়ে, পতির নিন্দা শুনে সতী করলেন দেহত্যাগ। ক্রুদ্ধ মহাদেব সতীর শীতল শব কাঁধে শুরু করলেন প্রলয় নাচন। এই বুঝি সবকিছু ধ্বংস

হয় হয়। তখন বিষ্ণু আহ্বান করলেন তাঁর চক্রকে। সেই চক্র সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে। এক একটি খণ্ড যেখানে পড়েছে, সেখানেই গড়ে উঠেছে শক্তিপীঠ। পুরাণ মতে, বিষ্ণুর চক্রে খণ্ড-বিখণ্ড সতীর দেহের জিভটি নাকি পড়েছিল আজকের হিমাচল প্রদেশের কাংড়া অঞ্চলে। সেখানকার রাজা তখন ছিলেন ভূমিচাঁদ। একদিন রাতে তিনি স্বপ্নে এই উপত্যকায় মন্দির তৈরির নির্দেশ পান। তারপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। দেবীর জিভ এখানে পড়ার জন্য দেবী অনন্ত অগ্নিময় জ্যোতিরূপে এখানে ভক্তদের দর্শন দিয়ে থাকেন। সতীর জিভ যেখানে পড়েছিল বলে কথিত আছে, সেখানে আদৌ কিন্তু কোনও জিভ নেই, আছে শুধু লকলকে অগ্নিশিখা, অনির্বাণ জ্যোতি। একটি নয়, সাত-সাতটি। এই আগুন শিখাকে ছুঁয়ে দেখা যায় এমন বিশ্বাস ভক্তদের। প্রশ্ন হল কি নাম এই দেবীর ?

উঃ-জ্বালামুখি দেবী

৫। হিন্দুপুরান তথা দেবী ভাগবাত পুরান অনুসারে সুভূতির ঔরসে ও তপতী নামের রাক্ষসীর গর্ভে মহাদেবের বরে ত্রিভুবন বিজয়ী ও মহাবলশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এক অসুর নাম গন্ধাসুর। সুভূতি বৈশ্যকন্যা সুরূপাকে হরণ করিতে গিয়ে বৈশ্যগণ কর্তৃক অপমানিত তিরস্কৃত ও হৃতসর্ব্বস্ব হয়। পিতার সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গন্ধাসুর বৈশ্যবংশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার অনুচরগণ একদিন সুবর্ণবট নামক এক বৈশ্যকে বধ করে, তাহার পূর্ণগর্ভা পত্নী চন্দ্রাবতী গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তিনি অরণ্য-মধ্যে একটি কন্যা প্রসব করে মারা যান। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কশ্যপ ধ্যানযোগে চন্দ্রাবতীর গর্ভে দেবী বসুন্ধরার অংশাবতার জন্মগ্রহণ করেছেন অবগত হয়ে তাঁকে নিজের আশ্রমে নিয়ে এসে প্রতিপালন করিতে লাগলেন। বড় হয়ে সেই কন্যা পিতার নিধন ও অরণ্য মধ্যে মাতার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ যেনে অসুরগণের বিনাশকামনায় মহামায়ার তপস্যায় বসেন। গন্ধাসুর সেই কন্যার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা জেনে বিবাহ করতে চান এবং ধ্যানস্থ কন্যার সবলে কেশাকর্ষণ করেন। এর পর ওই কন্যা এক দেবীতে পরিণত হয়। বহু যুদ্ধের পর গন্ধাসুর কে বধ করেন। প্রশ্ন কোন দেবীর কথা বলছি এখানে?

উঃ-গন্ধেশ্বরি মাতা

৬। হিন্দুপুরান তথা শিবপুরান অনুসারে মহাদেব শিবের ছিল তিনটি চোখ। একবার শিবের কনিষ্ঠ পুত্র গণেশ শিবের এই তৃতীয় চোখের প্রতি আকৃষ্ট হন। শিব তাঁর ধ্যানে বসলে গণেশ বারবার শিবের তৃতীয় নেত্র স্পর্শ করার চেষ্টা করেন। এতে শিবের ধ্যানে ব্যাঘাত হচ্ছিল। তাই তিনি গণেশকে তিন চোখের একটি বলসদৃশ বস্তু সৃষ্টি করে দেন। এ বলের গায়ে শিবের চুলের মত জটাও তৈরি করে দেন তিনি। বালক গণেশ সেই বল নিয়ে খেলতে থাকেন কৈলাসে। কিন্তু খেলতে খেলতে হঠাৎ তার হাত থেকে সে বল পড়ে যায় পৃথিবীতে। এরপর ওই জিনিস মাটিতে পড়ে এবং তা থেকে একটি ফলের সৃষ্টি হয় যা দেখতে অনেকটা মহাদেবের মতো এবং পুরানে এটিকে "শ্রীফল" ও বলা হয় পুরানে। প্রশ্ন হল কিসের কথা বলছি?

উঃ-নারকেল

৭। হিন্দু পুরান তথা মহাভারত অনুসারে এটি একটি শক্তিশালী অস্ত্র। এটি বসুমাতা দ্বারা নির্মিত একটি বিধংস্বী অস্ত্র এবং এই অস্ত্রটি পৃথিবীর গভীরে সুড়ঙ্গ তৈরি করতে পারে এবং রত্ন তলব করতে পারে। শুধুমাত্র অর্জুনের এই অস্ত্র ছিল। পিতামহ ভীষ্ম কে জল পান করানোর জন্য অর্জুন এই অস্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন। প্রশ্ন হল কী নাম এই অস্ত্রের?

উঃ-ভৌমাস্ত্র

৮। হিন্দুপুরান কাহিনী অনুসারে পুলস্ত্য ঋষি প্রাচীনকালে তীর্থযাত্রা করার সময় এই পুরান প্রসিদ্ধ পর্বতে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর তিনি দ্রোণাচল পর্বতকে অনুরোধ করলেন যে, তুমি তোমার পুত্র '-ক-' কে আমার হাতে দাও, আমি তাকে কাশীতে প্রতিষ্ঠা করব এবং সেখানে তার পূজা করব। দ্রোণাচল এই কথা শুনে দুঃখ পেলেন, কিন্তু '-ক-' পর্বত ঋষিকে বললেন যে আমি আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। আপনি আমাকে যেখানে রাখবেন, আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হব। পুলস্ত্য '-ক-' এর এই কথা মেনে নিলেন। তখন '–ক-' ঋষিকে বললেন, আমি দুই যোজন উঁচু আর পাঁচ যোজন চওড়া। আমাকে কাশীতে নিয়ে যাবেন কীভাবে? তখন পুলস্ত্য ঋষি বললেন যে আমি তোমাকে আমার তপোবল দ্বারা আমার হাতের তালুতে নিয়ে যাব। তারপর '-ক-' পর্বত ঋষির সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। এর পর ব্রজ নামক স্থানে '-ক-' আসতেই তার মাথায় খেলে যায় একটা বুদ্ধি এবং '–ক-' শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার সাথে দেখা করার জন্য পুলস্ত্যর হাতে ভারি হয়ে যায় এবং পুলস্থ্য তাকে ব্রজে রাখলেই '-ক-' সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ও লাভ করে। প্রশ্ন হল কি নাম এই পর্বত '-ক-' এর?
উঃ-গিরি গোবর্ধন

৯। হিন্দু পুরান তথা রামায়ন অনুসারে ইনি ছিলেন ত্রিজটা নামক রাক্ষসী, যিনি ছিলেন খুব রাম ভক্ত এবং ইনি মাতা সীতাকে সর্বদা আগলে রাখতেন সমস্ত বিপদ থেকে। রামচন্দ্র এনার এই অগাধ ভক্তি দেখে এনাকে বিশেষ বর দেন এবং বলেন তোমার এই ভক্তির দাম তুমি পাবে। এই ভাবে রামচন্দ্রের দেওয়া কথা সত্যি হয়। ত্রিজটা রাক্ষসীর আবার জন্ম নেন। প্রশ্ন হল পরের জন্মে ত্রিজটা কি রুপে জন্ম নিয়েছিলেন?
উঃ-সুভদ্রা

১০। গরুড়ের ভয়ে এই হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল কালীয় নামে এক মহাবিষধর সাপ। তার বিষে হ্রদের জল হয়ে গিয়েছিল বিষাক্ত। যে-কেউ ঐ হ্রদের জল পান করলে হঠাৎ মারা যেত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের সঙ্গে নিয়ে ঐ হ্রদের পাড়ে খেলছিলেন। তখন তৃষ্ণার্ত হয়ে কয়েকজন বালক হ্রদের জল পান করে। এতে তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা জীবন ফিরে পায়। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই এই হ্রদে বিষধর কোনো সাপ আছে। তার বিষেই হ্রদের জল বিষাক্ত হয়েছে। তিনি তখন দিব্যজ্ঞানে কালীয় নাগের কথা জানতে পারেনএবং কালীয় নাগকে বধ করেন প্রশ্ন হল এই হ্রদটির নাম কি ছিল?
উঃ-কালিন্দী

১১। নীলাম্বরী, বিনোদিনী, গান্ধর্বী, হ্লাদিনী, রাসেশ্বরী, মাধবী, শ্যামা, মানিনী, সর্বেশ্বরী ইত্যাদি এই নাম গুলো কোন বিখ্যাত পৌরানীক চরিত্রের বিভিন্ন নাম?
উঃ-রাধা

১২। হিন্দু পৌরানীক কথা অনুসারে এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শাস্ত্রের নানা কাহিনী। হিন্দু শাস্ত্রে ও বেদে পৃথিবীকে মা বলা হয়ে থাকে। এমনকি পৌরাণিক যুগেও পৃথিবীকে ধরিত্রী মাতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে।এই উৎসবের প্রকৃত বাংলা হল "জলসূচনা"।এই সময় থেকে প্রকৃতির নব সৃষ্টি কার্যর সূচনা হয়। মনে করা হয়, এই তিথির দিন মৃগশিরা নক্ষত্রের চতুর্থ পদে ঋতুমতী হন ধরিত্রী। পূর্ণ বয়স্কা ঋতুমতী নারীরাই কেবল সন্তান ধারণে সক্ষম হন। তাই এই উৎসবের পর শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে ধরিত্রী মা। প্রশ্ন হল কোন পবিত্র উৎসব বা তিথির কথা জানতে চাইছি আমি?
উঃ-অম্বুবাচী

১৩। হিন্দু পুরান মতে এই দেবী হলেন আমাদের সবার খুব পরিচিত এক দেবী। এই দেবীর একটি সুপরিচিত রূপ হল পাঁচটি মাথা যা (মুক্ত, বিদ্রুমা, হেমা, নীলা, ধবলা) এগুলোর প্রতীক। ইনি এনার দশটি চোখ দিয়ে পৃথিবী ও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন এবং দশটি হাতে রয়েছে দশ রকমের অস্ত্র। বরাহপুরান এবং মহাভারত অনুসারে বৃত্রাসুর এবং তার স্ত্রী বেত্রাবতীর সন্তান ভেত্রাসুরকে বধ করার জন্য ইনি শক্তিশালী দেবী রূপে আবির্ভুত হন। কে ইনি?
উঃ- গায়ত্রি মাতা

১৪। হিন্দু পুরাণের অন্যতম দেবতা ইনি যাঁর স্ত্রীর নাম "ভদ্রা"। যাঁর নামের অর্থ কদাকার বা দৈত্যাকার। বর্তমানে আমরা এই দেবতার উদাহরন প্রায়শই দিয়ে থাকি বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে। প্রশ্ন হল কোন দেবতা ইনি?
উঃ- কুবের

১৫। আমরা বিভিন্ন দেব দেবীর পুজা করে থাকি। হিন্দু পুরান মতে এই দেবতা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন 'আয়োগ'(বন্ধন), 'আমোদ'(আনন্দদায়ক), 'অনভ'(অপার ভালোবাসা), 'দেবব্রত'(যে কোন বিচার ছাড়া পুজা গ্রহণ করেন), 'দুর্জা' (যাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না)। প্রশ্ন হল আমি কোন দেবতার বিষয়ে কথা বললাম?
উঃ-বিঘ্নেশ্বর